# অনিকের জন্য ভালোবাসা

**১. মার সঙ্গে দিব্যেন্দুর বিয়ে**

আমার নাম অনীক। স্কুলে আমার ক্লাসের ছেলেমেয়েরা ডাকে শুধু নিক। লন্ডনের সাউথগেট কমিউনিটি স্কুলের সেভেন্থ গ্রেডে পড়ি। আমার বয়স ষোল, উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, ওজন একশ বেয়াল্লিশ পাউন্ড। গায়ের রং বাদামি, চুল কালো, চোখের রঙও কালো। আমার জন্ম বাংলাদেশের সিলেটে, এখন বৃটিশ নাগরিক। আমার মা পনেরো বছর ধরে লন্ডনে আছে, বিবিসি-তে চাকরি করে।

বাবার কথা আমার মনে পড়ে না। আমার যখন বয়স এক বছর তখন মার সঙ্গে বাবার সম্পর্ক ভেঙে যায়। মা আমাকে নিয়ে লন্ডনে চলে আসে। এত বছর ধরে লন্ডনে থাকলেও মা নিজের দেশকে ভুলতে পারেনি। তার ঘরে তিন আলমারি বাংলা বই, কয়েকশ বাংলা গানের এল পি, অডিও ক্যাসেটের কোনো হিসেব নেই। টেলিভিশনে বাংলা ছবি দেখালে মা ওটা রেকর্ড করে রাখে, আর ছুটির দিনগুলোতে ঘুরে ফিরে দেখে। মা আমাকে ছোটবেলা থেকে বাংলা শিখিয়েছে যত্ন করে। আমার বয়সী যে কোনো বাঙালি ছেলের চেয়ে আমি ভালো বাংলা লিখতে পারি। স্কুলে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আমি জার্মান নিয়েছি। বাংলা এত ভালো জানলেও বলার সময় মার মতো কিংবা দিব্যেন্দুর মতো তাড়াতাড়ি বলতে পারি না।

দিব্যেন্দু মার সঙ্গে বিবিসিতে কাজ করে। দুবছর আগে মা ওকে বিয়ে করেছে। বাইরের লোকজনের সামনে দিব্যেন্দুকে বাবা বলি, ঘরে নাম ধরে ডাকি। বয়স চল্লিশ, মার চেয়ে দুবছরের বড়। তবে স্বাস্থ্য ভালো বলে তিরিশের বেশি মনে হয় না। আমার চেয়ে দিব্যেন্দু অনেক হ্যান্ডসাম। ফর্শা তো বটেই, চেহারাও খুব শার্প, অনেকটা টম ক্রুজের মতো। দিব্যেন্দু যখন মাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলো তখন ওদের কমন বন্ধুরা খুব অবাক হয়েছিল। যে অর্থে মেয়েদের সুন্দরী বলা হয় মা সে অর্থে সুন্দরী নয়। গায়ের রং আমার চেয়ে সামান্য ফর্শা, চশমা পরা গম্ভীর চেহারায় মাকে তার বয়সের চেয়ে বেশি বয়স্ক মনে হয়।

বিয়ের অনেক আগে থেকেই দিব্যেন্দু আমাদের বাড়িতে আসতো। ছোটবেলায় সে আমাকে তার নাম ধরে ডাকতে শিখিয়েছে। বলেছে আমার একজন ভালো বন্ধু সে। তার মতো চমৎকার মনের মানুষ আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। ছোটবেলা থেকেই দেখছি আমার যখন যা দরকার বলার আগেই কীভাবে সে টের পেতো আমি জানি না। ঠিক নিয়ে আসতো। মজার কোনো ইউনিভার্সাল ছবি রিলিজ হলে প্রথম

দিনই তিনখানা টিকেট কেটে হাজির হবে । মা প্রথম প্রথম আপত্তি করতো। শেষে এটা রুটিন ব্যাপার হয়ে গিয়েছে।

বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে সবার আগে দিব্যেন্দু কথা বলেছিলো আমার সঙ্গে। রোজকার মতো স্কুল থেকে ফিরে আমি ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ঘর খুলে ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে টেলিভিশনের সামনে খেতে বসবো, এমন সময় ডোরবেল বাজলো। মা অফিসে যায় সকালে, ফেরে রাত সাতটার দিকে। আমি দরজা খুলে দিব্যেন্দুকে দেখে অবাক হলাম। কারণ মা না থাকলে সে আসে না। বললাম, মা তো অফিসে!

জানি। আমি অফিস থেকেই আসছি। দিব্যেন্দু সামান্য হেসে বললো, আজ আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। কী করছো তুমি?

কিছু না। আমি বললাম, খাওয়া নিয়ে বসতে যাচ্ছিলাম।

তোমাকে নিয়ে যদি বাইরে কোথাও খাই তুমি কি আপত্তি করবে?

বাইরে খেতে আমি খুব ভালোবাসি। বললাম, আমি খুশি হবো।

দিব্যেন্দু আমাকে নিয়ে নিরিবিলি এক ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে এলো। আমি যা পছন্দ করি সেসব খাবারের অর্ডার দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছিলো। আমি বললাম, আমার সঙ্গে কী কথা বলবে দিব্যেন্দু?।

কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে দিব্যেন্দু বললো, আমাকে তোমার কেমন মনে হয় অনীক?

কেমন আবার মনে হবে! খুবই ভালো মনে হয়।

তুমি এখন বড় হয়েছে। কখনও কি লক্ষ্য করেছে তোমার মা কি রকম লোননি?

মাঝে মাঝে মনে হয় লোননি। তবে মা তো কাজের ভেতর ডুবে থাকতে বেশি ভালোবাসে।

অন্য কারও ভালোবাসা পায়নি বলে কাজ ভালোবাসে।

কেন পাবে না? দিব্যেন্দুর কথায় মনঃক্ষুণ্ন হলাম–মাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।

তুমি তো ছেলে। নিশ্চয় তুমি ভালোবাসবে। আরও ভালোবাসা দরকার তোমার মার।

আমি ছাড়া মাকে আর কে ভালোবাসতে যাবে?

আমি তোমার মাকে ভালোবাসি।

তা হলে আরও ভালোবাসার দরকার বলছো কেন?

আমি তোমার মাকে বিয়ে করতে চাই। শান্ত গলায় কথাগুলো বললো দিব্যেন্দু।

আমি ওর কথা শুনে চমকে উঠেছিলাম। বিয়ে মানে মা আর আমার মাঝখানে আরেকজন আসবে। মা কি আমাকে বোর্ডিং স্কুলে দিয়ে দেবে? ভাবতে গিয়ে ভয় হলো। বললাম, মাকে কি বলেছো একথা?

বলেছি।

মা কী বললো?

বলেছে তোমার সঙ্গে কথা বলতে। তুমি হ্যাঁ বললে ঠিক আছে। তুমি না বললে তোমার মাও না বলবে।

বিয়ের পর তোমরা কি আমাকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেবে?

কক্ষনো না। আমরা সবাই একসঙ্গে থাকবো। তুমি এখন যেরকম বন্ধু আছো, আরও কাছের বন্ধু হবে।

আমাদের কি তোমার বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে?

তুমি কী চাও?

আমি চাই মাকে বিয়ে করে তুমি আমাদের বাড়িতে থাকবে।

আমার কথা শুনে দিব্যেন্দু গলা খুলে হাসলো–তুমি যা চাও তাই হবে।

দিব্যেন্দুকে আমি কী বলবো ভেবে পেলাম না। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলাম–তুমি কি মনে করো মা এতে সুখী হবে?

দিব্যেন্দু গম্ভীর হয়ে বললো, আমি জানি হবে।

ঠিক আছে দিব্যেন্দু। একটু ইতস্তত করে আমি বললাম, মাকে তুমি বিয়ে করতে পারো। আই উইশ ইউ গুড লাক।

থ্যাঙ্ক ইউ অনীক। হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে দিব্যেন্দু মৃদু হেসে বললো, আমার ভয় হচ্ছিলো–তুমি যদি রাজি না হও!

দিব্যেন্দুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললাম, মাকে আমি সুখী দেখতে চাই।

দিব্যেন্দু শান্ত গলায় বললো, আমরা সবাই সুখী হবো অনীক।

মার বিয়েতে কোনো হৈচৈ হলো না। বিবিসি থেকে মা আর দিব্যেন্দুর কজন কমন ফ্রেন্ড এসেছিলো। আমার লেবানিয় বান্ধবী শীলা এসেছিলো। মার বিয়ের কথা শুনার পর থেকে ও আসার জন্য উদগ্রীব হয়েছিলো।

মা বলে দিয়েছিলো আঠারো বছরের আগে আমাকে হার্ড ডিংক্স দেয়া হবে না। মার বিয়ের রাতে দিব্যেন্দু ডিনারের পর শব্দ করে শ্যাম্পেনের বোতল খুললো। বোতলের মুখ দিয়ে সাদা ফেনার ফোয়ারা ছুটলো। সবাই শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে দিব্যেন্দুর দিকে এগিয়ে গেলো। শীলা আমার কাছে

দাঁড়িয়েছিলো। সবার গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে দিব্যেন্দু ছোট গ্লাস এনে আমার আর শীলার হাতে ধরিয়ে দিলো। তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে মাকে বললো, আশা করি আজকের রাতের জন্য ওরা এক পাত্র পান করতে পারবে।

মা কোনো কথা না বলে মৃদু হাসলো। বিয়ের রাতে খুব হালকা বেগুনি রঙের একটা জামদানি পরেছিলো মা। শাড়ির ভেতর ধবধবে সাদা সুতোর নকশা। মাকে অনেক সুন্দরী মনে হচ্ছিলো। শীলাও বললো, তোমার মাকে দারুণ গ্রেসফুল লাগছে। মনেই হচ্ছে না তোমার মতো বড় একটা ছেলে আছে ওর। দিব্যেন্দুর এক বন্ধু মাকে আর আমাকে নিয়ে ওর সঙ্গে রসিকতা করলো এ্যাদ্দিন পরে বিয়ে করে তুই সবাইকে হারিয়ে দিয়েছিস। রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব শুধু নয়, রাজপুত্রের মতো একটা ছেলেও রেডিমেড পেয়ে গেলি। দিব্যেন্দুও হেসে জবাব দিলো মনে হচ্ছে হিংসায় তোদের বুক ফেটে যাচ্ছে। আই অ্যাম প্রাউড অব মাই সন। বলে দিব্যেন্দু আমার কপালে চুমো খেলো নিক শুধু আমার ছেলে নয়, আমরা দুজন চমৎকার বন্ধু।

শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে দিব্যেন্দুর কথা শুনে মনে হলো আমার বয়স অনেক বেড়ে গেছে। আমার অ্যালবামে বাবার একটা ছবি আছে। আমার বয়স তখন এক। মা বাবা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, আমি বাবার কোলে। ছবিটা সাদা কালো হলেও এত বছরেও নষ্ট হয়নি। ছবিতে মাকে যে রকম সুন্দর দেখাচ্ছিলো দিব্যেন্দুর সঙ্গে বিয়ের রাতে আরও সুন্দর মনে হচ্ছিলো। মনে হলো দিব্যেন্দু মিথ্যে বলেনি, মা সত্যি সুখী হয়েছে।

মার সঙ্গে দিব্যেন্দুর বিয়ের প্রথম বছরটা চমৎকার কাটলো। ওদের বিয়ে হয়েছিলো ডিসেম্বরে। এক বছর পর উইন্টার ভ্যাকেশনে আমরা ইন্ডিয়া গিয়েছিলাম। দিব্যেন্দুদের বাড়ি কলকাতায়।

সেবার খুব মজা হয়েছিলো কলকাতায়। আমরা দিব্যেন্দুদের বাড়িতে না উঠে গ্রেট ইস্টার্ন নামের একটা হোটেলে উঠেছিলাম। দিব্যেন্দুরা জয়েন্ট ফ্যামিলি। ওর বাবা, মা, বড় দুই ভাই, দুই কাকা আর তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেশ বড় পরিবার। সবাই ভবানীপুরের পুরোনো এক বাড়িতে একসঙ্গে থাকে। দিব্যেন্দু বলেছে ওদের পরিবার গোঁড়া। অন্য ধর্মের মেয়েকে বিয়ে করার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিলো ওর বাবা। বাড়িতে ওর বাবা সবার বড়। তার কথা কেউ অমান্য করে না।

দিব্যেন্দুর মা অবশ্য বিয়ের পর ছেলেকে চিঠিতে লিখেছিলো–তোর যা ভালো। মনে হয় করবি। তুই সুখী হলে আমিও সুখী হবো। বৌমা আর দাদুভাইকে আমার আশীর্বাদ আর আদর দিস। দিব্যেন্দু ওর মার চিঠি আমাকে পড়তে দিয়েছিলো। একজন অচেনা মহিলা আমাকে দাদুভাই বলে চিঠিতে আদর

পাঠিয়েছে পড়ে ভালোই লেগেছিলো। দিব্যেন্দুকে বলেছিলাম, তোমার মাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। দিব্যেন্দু বলেছিলো, মা–ও বউ দেখতে চেয়েছে। আমরা সামনের উইন্টারে কলকাতা যাবো।

কলকাতা আসার আগে দিব্যেন্দুর মা লিখেছিলো–হুট করে বউ নিয়ে বাড়িতে এসে উঠিস না। তোর বাবাকে এখনও মানাতে পারিনি। তোরা বরং তোর বন্দনা মাসির বাড়িতে উঠিস। বন্দনাকে আমি বলেছি। তোরা ওর বাড়িতে উঠলে ও খুশি হবে।

প্লেনে উঠে দিব্যেন্দু বললো, মাসি-টাসি নয়, আমরা হোটেলে উঠবো।

দিব্যেন্দুর সিদ্ধান্ত জানতে পেরে মা আর আমি দুজনই খুশি হয়েছিলাম। অচেনা কারও বাড়িতে থাকতে আমি যে পছন্দ করি না একথা মা ভালোভাবেই জানে। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলটাও বেশ ভালো। লন্ডনে এরকম চেহারার অনেক হোটেল দেখেছি। কলকাতা শহরটাও অনেকটা লন্ডনের মতোই। একটু বেশি পুরোনো আর নোংরা এই যা তফাত।

কলকাতায় দিব্যেন্দুর অনেক বন্ধু ছিলো। বিয়ের খবরও বন্ধুদের কাউকে জানায়নি সারপ্রাইজ দেবে বলে। হোটেলে ও একটা রিসেপশনে বন্ধুদের নেমন্তন্ন করেছিলো। সবাই মাকে দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। বিবিসি যারা শোনে তারা মার নাম জানে। দিব্যেন্দুকে বিয়ে করার পর আমি হঠাৎ করেই যেন আবিষ্কার করলাম আমার মা দেখতে রীতিমতো সুন্দরী। বিয়ের আগে একটুও সাজতে দেখিনি মাকে। মোটা কালো ফ্রেমের চশমার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতো বলে মনে হতো তেমন সুন্দরী নয়, বয়স্কও মনে হতো। বিয়ের পর মা চশমার ফ্রেম পাল্টিয়ে সরু গোল্ডেন ফ্রেম নিয়েছে, একটু মেকাপ নেয়াও শুরু করেছে–এতেই মার চেহারা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেলো। দিব্যেন্দুর বন্ধুর স্ত্রীরা সবাই ওকে বললো, চমৎকার বউ হয়েছে দিব্যেন্দু।

আমার সবচেয়ে মজা লেগেছিলো যখন ওরা আমাকে মার ভাই ভেবেছে। এক মহিলা বললো, এ বুঝি তোমার শালা, বোনের সঙ্গে চেহারায় অনেক মিল আছে। শুনে আমি আর দিব্যেন্দু হাসতে হাসতে বিষম খেলাম। মা তো লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে গেলো। সবাই যখন আমার পরিচয় জানলো তখন ওদের একেক জনের চেহারা দেখার মতো হলো। এক মহিলার হাত থেকে প্লেট খসে পড়লো, আরেক জনের ড্রিংক্স আটকে গেলো গলায়, সবার চোখ গোল হলো, মুখ হা হয়ে গেলো আর আমরা হাসি চাপতেই ব্যস্ত। পরে এক মহিলা অসভ্যের মতো মার বয়স জানতে চেয়েছিলো।

কলকাতায় যাওয়ার পরদিনই দিব্যেন্দুর মা এসেছিলো হোটেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। মা ওর পা ধরে সালাম করতেই ভদ্রমহিলা মাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর নিজের গলার হার খুলে

মার গলায় পরিয়ে দিলো। মা আমাকে ইশারা করলো ওকে পা ধরে সালাম করার জন্য। এ কাজটা আমি খুবই অপছন্দ করি, তবু মার ইচ্ছায় করতে হলো। দিব্যেন্দুর মা আমার কপালে চুমো খেয়ে বললো, বেঁচে থাকো দাদুভাই।

আমাকে ওভাবে আদর করতে দেখে দিব্যেন্দু মুখ টিপে হাসছিলো। ওর মা সেই হাসি দেখতে পেয়ে বললো, আসছে বার আমি একটা ছোট্ট দাদুভাই দেখতে চাই।

মার কথা শুনে দিব্যেন্দু লজ্জা পেলো। আমি ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ঘরে চলে এলাম।

কথাটা মার বিয়ের পর আমিও ভেবেছি। মা আর দিব্যেন্দুর যখন ছেলেমেয়ে হবে তখন কি দিব্যেন্দু আমাকে এতখানি ভালোবাসতে পারবে? আমি জানি আমাকে দিব্যেন্দু এতটা ভালোবাসে বলেই মা ওকে বিয়ে করেছে। যখন দিব্যেন্দু নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে তখন মা কী করবে? মাকেও তো দিব্যেন্দুর ছেলেমেয়েদেরই বেশি সময় দিতে হবে। আমি কি তখন বোর্ডিং-এ চলে যাবো? আমার মতো অনেক ছেলেমেয়ে বোর্ডিং-এ থাকে বটে, আমি এটা একদম পছন্দ করি না। এত বছর লন্ডনে থেকেও আমার ভেতরটা একেবারেই বাঙালিদের মতো সেকেলে রয়ে গেছে। শীলা এ নিয়ে মাঝে মাঝে ঠাট্টাও করে। আমার কিছু করার নেই। আমি মার মতো এতটা বাঙালি না হলেও আমি যেমন আছি তেমনই থাকতে চাই।

কলকাতা থেকে আমরা দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর আর কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলাম। খুবই মজা হয়েছিলো সেবার। বিশেষ করে হোটেলে প্রায়ই আমাকে ম্যানেজার বা রিসেপশনিস্ট জিজ্ঞেস করতে দিব্যেন্দু আমার ব্রাদার ই-ল কিনা। ইন্ডিয়ার মানুষদেরও খুব ভালো লেগেছিলো আমার। অনেকটা বাঙালিদের মতোই স্বভাব। বৃটিশদের মতো গোমড়ামুখো নয়, সব কাজ ঘড়ির কাঁটা মেপে করে না। খুবই প্রাণখোলা মানুষ, ঢিলেঢালা স্বভাবের, ঘাড়ে পড়ে আলাপ জমাতে চায়। দিল্লি থেকে ট্রেনে আগ্রা যাওয়ার পথে রাকেশ বলে একটা ছেলে আমারই বয়সের নিজে থেকে আলাপ করলো এসে। ইংরেজি বলার সময় যদিও মনে হয় হিন্দিই বুঝি বলছে, বেশ হ্যান্ডসাম আর স্মার্ট, দেরাদুনে এক মিশনারি স্কুলে ক্লাস টেন-এ পড়ে। রাকেশও মাকে দেখে প্রথম ভেবেছিলো আমার বোন। আগ্রা আসার আগে ও আমার ঠিকানা রেখেছিলো, এখনও নিয়মিত চিঠি লেখে, ভিউকার্ড পাঠায়।

সেবার আমরা আঠারো দিন ছিলাম ইন্ডিয়াতে। ফিরেছি কলকাতা হয়ে। দিব্যেন্দুর মা আরও দুবার এসেছিলো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। মা কাশ্মীর থেকে ওর জন্য খুব দামী একটা শাল কিনেছিলো। ওটা পেয়ে দিব্যেন্দুর মা খুব খুশি হয়েছিলো।

যেদিন সন্ধ্যায় আমরা লন্ডনের ফ্লাইট ধরবো সেদিন সকালে দিব্যেন্দুর মা শেষবার এসেছিলো আমাদের হোটেলে। যাওয়ার সময় দিব্যেন্দু আর মাকে জড়িয়ে কান্নাকাটিও করলো। দিব্যেন্দুকে বললো, তোর ভাইদের কারও তো ছেলে হলো না। বাড়ি ভরা গুচ্ছের মেয়ে। বৌমার একটা খোকা হলে তোর বাবা আর মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। বৌমার বয়স তো আর কম হয়নি.....

দিব্যেন্দুর মার কথা বলার ধরন আমার ভালো লাগেনি। তাই চুপচাপ সরে এসেছিলাম ওদের কাছ থেকে।

.

**২. দিব্যেন্দুর পরিবর্তন**

লন্ডনে ফেরার পর আবার শুরু হল আমাদের রুটিনবাঁধা জীবন। সকালে গাড়ি নিয়ে দিব্যেন্দু, মা আর আমি একসঙ্গে ঘর থেকে বেরোই। আমি বিকেলে ফিরি। ওরা ফেরে রাতে। উইকএন্ডে আমি কখনও ওদের সঙ্গে, কখনও শীলা কিংবা স্কুলের অন্য বন্ধুদের সঙ্গে শহরের বাইরে কোথাও বেড়াতে যাই। ছুটির দিন সারা সপ্তাহে জমিয়ে রাখা বাকি কাজ করি। আমি অবশ্য বাগানের কাজ ছাড়া কিছুই করি না। বাকি সব মা আর দিব্যেন্দু করে। দিব্যেন্দু এ বাড়িতে আসার পর আমাদের একটা লাভ হয়েছে। ওর একটা মস্ত বড় জাগুয়ার গাড়ি ছিলো। সেটা আমার স্কুলে যাওয়া আর মার অফিসে যাওয়ার সময় অনেক বাঁচিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া সন্ধ্যার পর টিউব স্টেশনগুলোয় মাতাল, গুন্ডা আর স্কীনহেড শয়তানদের উৎপাত লেগেই থাকে। গুন্ডারা কয়েকবারই মার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমাকে একবার মারার জন্য তাড়া করেছিলো স্কীনহেড গুন্ডারা। দিব্যেন্দু বলে দিয়েছে সন্ধ্যায় স্কুলে দেরি হলে ওকে যেন ফোন করি। যখনই ফোন করেছি দিব্যেন্দু নিজে ড্রাইভ করে এসে নিয়ে গেছে।

রুটিনবাঁধা হলেও লন্ডনের জীবন কখনও নিরানন্দের মনে হয়নি। বিশেষ করে মার সঙ্গে দিব্যেন্দুর বিয়ের প্রথম বছর চমৎকার কেটেছিলো আমাদের। ইন্ডিয়া থেকে ফিরে এসে ওদের প্রথম বিয়ে বার্ষিকীতে দিব্যেন্দু বড় একটা পার্টি দিয়েছিলো। আমাকে দিব্যেন্দু বলেছিলো, তোমার যত খুশি বন্ধু ইনভাইট করতে পারো তবে কতজন হবে সংখ্যাটা আগে বলে দিও। পার্টিতে আমার বন্ধু এসেছিলো চার জন। দুর্ভাগ্যের বিষয় লন্ডনে আমার কোনো বাঙালি বন্ধু নেই। আবার যারা এসেছিলো তারা কেউই ইংলিশ নয়। শীলার কথা আগেই বলেছি–সে ছিল লেবানি, ভিকি হচ্ছে ইন্ডিয়ান, জেন হাঙ্গেরিয়ান আর মাহমুদ জর্ডানের। মার এক দূর সম্পর্কের খালা থাকে ম্যানচেস্টারে, মার চেয়ে বয়সে

সামান্য বড় হবে, সেও এসেছিলো। লন্ডনে দিব্যেন্দুর কোনো আত্মীয় ছিলো না, সবই বন্ধু। সবাই খুব দামী দামী উপহার দিয়েছিলো। ফুলে ফুলে সারা বাড়ি সেদিন বোঝাই হয়ে গিয়েছিলো।

মা আর দিব্যেন্দুর বিয়ের তারিখ ছিলো ডিসেম্বরের সাতাশ-এ। চারদিন পর নিউ ইয়াস ডে। মাকে বলে সেবার নতুন বছরের উৎসব করলাম স্কটল্যান্ডে। আমাদের সবচেয়ে বড়লোক বন্ধু ছিলো জেন। স্কটল্যান্ড গ্র্যাম্পিয়ন পর্বতের কাছে স্টার্লিং-এ ওদের মস্ত খামার বাড়ি। ওর দাদা এসেছিলো হাঙ্গেরি থেকে, এখন ওরা পুরো বৃটিশ হয়ে গেছে। আমাদের বারো জনকে ও বিশেষভাবে নেমন্তন্ন করেছিলো নতুন বছরটা ওদের ওখানে কাটাতে।

আমরা সবাই একদিন আগেই চলে গেলাম ট্রেনে চেপে। সেবার দারুণ মজার উৎসব হয়েছিলো তিন দিকে পাহাড়-ঘেরা জেনদের খামারবাড়িতে। থার্টি ফার্স্ট নাইটে সবাই সারা রাত জেগেছিলাম। একটু পুরোনো ধাতের মানুষ হলেও জেনের বাবা দারুণ মজার সব গল্প বলতে পারে। খাওয়ার মেনুতে আমাদের জন্য বারবেকিউ ছিলো, নন অ্যালকহলিক ককটেল ছিলো আর ছিলো কয়েক রকমের প্রচুর সালাদ। আঠারো বছর না হলে হার্ড ডিং দেয়া যাবে না–এরকম সেকেলে নীতিতে বিশ্বাসী ছিলো জেনের বাবা।

জেনদের খামারে তিনদিন কাটিয়ে হালকা মনে লন্ডনে ফিরে এসে দেখি বাড়ির বাতাস কেমন যেন ভারি হয়ে আছে। দিব্যেন্দু আর মাকে যেরকম রেখে গিয়েছিলাম ওরা সেরকম আর নেই। রাতে খেতে বসে জেন-এর বাবার কাছ থেকে শোনা দুটো মজার জোক্স বলেছিলাম। শুনে মা সামান্য হাসলো কিন্তু দিব্যেন্দু যেন শুনতেই পায়নি এমনভাবে খেতে লাগলো।

আমাদের রাতের খাওয়া সাড়ে আটটার ভেতর হয়ে যায়। ঘুমোতে যাই দশটায়। এ দু ঘন্টা আমরা টিভি দেখি, নয়তো ভিডিও ক্লাব থেকে মার আনা কোনো বাংলা ছবি দেখি। মাঝে মাঝে, দিব্যেন্দু আর আমি আমাদের পছন্দের কোনো হরর নয়তো সাইফি ছবি আনি। আমরা দুজনেই সায়েন্স ফিকশন আর হরর পছন্দ করি। সেদিন টিভি র‍্যাকের নিচের তাকে দেখি দুটো নতুন হরর ছবি রয়েছে। দিব্যেন্দুকে বললাম, বাবা, তুমি কি এ ছবি দুটো দেখেছো?

বিয়ের পর আমি লক্ষ্য করেছি দিব্যেন্দুকে বাবা ডাকলে মা খুশি হয়। মাঝে মাঝে মাকে খুশি করার জন্য বাইরের কেউ না থাকলেও দিব্যেন্দুকে বাবা ডাকতাম। ও তখন রান্নাঘরে প্লেট ডিশ ধধায়ার কাজে মাকে সাহায্য করছিলো। আমার কথার জবাবে বললো, তোমার ইচ্ছে হলে দেখতে পারো।

দিব্যেন্দুর কথার ধরণ দেখে মনে হলো ওর ছবি দেখার তেমন ইচ্ছে নেই। মুড ভালো থাকলে ও বলতো, খবরদার, আমি আসার আগে টিভি অন করবে না। আমি একটা ফ্রেমও মিস করতে চাই না। তারপর ও আর মা দু কাপ কফি এনে সোফায় বসে। আমি ছবি চালাই। মা আমাদের সঙ্গ দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে বলে, সবগুলো হরর ছবি আমার একরকম মনে হয়। তোমরা কী যে মজা পাও আমি বুঝি না। আমার তো মাঝে মাঝে গা গুলোয়।

দিব্যেন্দুকে বললাম, তোমরা তাড়াতাড়ি এসো। আমি ক্যাসেট রিওয়াইন্ড করছি।

আমাদের আগে যে এ ক্যাসেটটা নিয়েছিলো সে রিওয়াইন্ড না করে ক্লাবে ফেরত দিয়েছে। নির্ঘাত নতুন কোনো ইন্ডিয়ান মেম্বার হবে। এরা প্রায়ই ক্যাসেট রিওয়াইন্ড না করে ফেরত দিতে এসে জরিমানা দেয়। সেটা আবার পরে যে নেয় তার টাকা থেকে বাদ যায়। টাকা অবশ্য বেশি নয়, মাত্র পঁচিশ পি–তাই বা মন্দ কী। চারটা ক্যাসেটে এক পাউন্ড। এরকম প্রায়ই হয়। আমাদের পাড়ায় ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা বাড়ছে।

রান্নাঘরের কাজ সেরে দিব্যেন্দু একা এলো কফির কাপ হাতে। একটু পরে মা এসে শুকনো গলায় বললো, তোমরা ছবি দেখ। আমার মাথা ধরেছে, শোব। মা আর কিছু না বলে ওদের বেডরুমে ঢুকলো।

আমি ছবি ছাড়লাম। দিব্যেন্দু সোফায় ওর নিজের জায়গায় বসে এক মনে ছবি দেখতে লাগলো। তেমন আহামরি ছবি ছিলো না। দশ পনেরো মিনিট পরপরই বিজ্ঞাপন। আমাদের রিমোট খারাপ হয়ে গেছে কদিন হলো, নতুন কেনা হয়নি আলসেমি করে। বিজ্ঞাপন দেখানোর অবসরে, দিব্যেন্দুকে বললাম, তোমাকে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? শরীর ভালো আছে?

দিব্যেন্দু গম্ভীর হয়ে কোনো কথা না বলে শুধু মাথা নাড়লো। আমি আবার বললাম, মাকেও মনে হলো বেশ ডিপ্রেসড় । তুমি কি কিছু আঁচ করতে পেরেছো?

তোমার মায়ের শরীর ভালো নয়। এর বেশি দিব্যেন্দু কিছু বললো না। ওর গলাটা একটু রুক্ষ মনে হলো। মা সম্পর্কে কিছু বললে ও মার নাম ধরে বলে, কখনও–তোমার মা বলে না।

প্রথম দিকে ছবিটা সুবিধার মনে না হলেও একটু পরে বেশ জমে গেলো। একটা হন্টেড প্যালেসে একটার পর একটা ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটছে। অন্য সময় হলে দিব্যেন্দু আর আমি দম বন্ধ করে ছবি দেখতাম। অথচ তখন আমার একটুও ইচ্ছে করলো না ছবিটা দেখতে। দিব্যেন্দু যদিও তাকিয়ে ছিলো টেলিভিশনের দিকে, ওর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিলো ছবি সে মোটেও উপভোগ করছে না। কিছুক্ষণ

পর আমি আস্তে করে দিব্যেন্দুকে জিজ্ঞেস করলাম, মার সঙ্গে কি কোনো ব্যাপারে তোমার মনোমালিন্য হয়েছে? মনোমালিন্য শব্দটা ভেবে বের করতে বেশ সময় লাগলো। যদিও মনে হচ্ছিলো বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে কথাটা, বাংলা ভালো জানলে হয়তো অন্যভাবে বলতে পারতাম। মার কড়া বারণ ছিলো বাড়িতে বিদেশী ছাড়া কারও সঙ্গে ইংরেজি বলা চলবে না।

দিব্যেন্দু আমার কথা শুনে একটু বিরক্ত হলো। ওর কপালে ভাঁজ পড়লো। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে বললাম, তোমাকে আমি আঘাত দিতে চাইনি।

একটু পরে দিব্যেন্দু ঠান্ডা গলায় বললো, সব মানুষের কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে অনীক। তুমি এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে বলেই তোমার জানা দরকার, সব কথা জানতে নেই। বিশেষ করে যা কারও একান্ত ব্যক্তিগত।

আমার বয়স ষোল। আমার বন্ধুদের চেয়ে পড়াশোনায় বেশি সিরিয়াস বলে অনেকে বলে বয়সের তুলনায় আমি নাকি অনেক ম্যাচিউরড। আমি জানি সব কিছু জানার ব্যাপারে আমার যে কৌতূহল আছে সেটা ঠিক ম্যাচিউরিটির পর্যায়ে পড়ে না। অনেকটা ছেলেমানুষি হয়ে যায়, তবু আমি এটা এড়াতে পারি না। আমার যে সব বন্ধু আছে তাদের কারওই এমন কোনো গোপন বা ব্যক্তিগত ব্যাপার নেই যা আমি জানি । শীলা, জেন, ভিকি নিজে থেকেই সব কথা বলে, ওদের কিছু জিজ্ঞেসও করতে হয় । আমার ব্যাপারে অবশ্য কাছের বন্ধুরা জানতে না চাইলে বলি না। কিন্তু এটা আমি বুঝি, বন্ধুর কাছে কোনো কিছু গোপন রাখা চলে না।

দিব্যেন্দু কথাটা যেভাবে বললো, মনে হচ্ছে ও আমাকে আর বন্ধু ভাবতে পারছে না। ওর কথা শুনে ওকে বন্ধু নয় বাবার মতোই মনে হলো, যারা কিনা শুধু উপদেশ দেয় আর চায় সব কিছু ওদের মতো করতে। নিজের বাবাকে কাছে না পেলেও অন্যদের বাবাকে তো দেখি–সব সময় ছেলেমেয়েদের ওপর নিজের মত চাপিয়ে দিচ্ছে ছেলেমেয়েদের কী করা উচিত, কী করা উচিত নয় সব বাবারা এ ব্যাপারে একমত । এমনকি জেনদের বাড়িতে যে গেলাম, শুনেছিলাম স্কটল্যান্ডের লোকেরা খুব খোলামনের হয়, কিন্তু সেখানেও একই অবস্থা। থার্টি ফাস্ট নাইটে জেন ওর বাবাকে অনেক ধরেছিলো বড়দের সঙ্গে আমাদেরও একটুখানি শ্যাম্পেন দিতে, বুড়োকে এতটুকু টলানো যায়নি।

বাবাকে নিয়ে মার সঙ্গে কখনও কোনো সিরিয়াস কথা হয়নি। বন্ধুদের বাবাদের দেখে কখনও মনে হয়েছে বাবা নেই, অনেক আরামে আছি। বাঙালী বাবারা ইউরোপিয়ানদের চেয়েও বেশি রক্ষণশীল হয়। এইটিথ সেঞ্চুরির উপন্যাসে যেমন দেখা যায় এখনও নাকি বাঙালি আর ভারতীয় বাবারা

ছেলেমেয়েদের অনেক বয়স পর্যন্ত ফিজিক্যালি মারধর করে। কী ভয়ঙ্কর কথা! আমি ভাবতেই পারি না কেউ আমার গায়ে হাত তুলতে পারে! মা কখনও আমাকে মারেনি। কোনো কারণে বিরক্ত হলে ডেকে বুঝিয়েছে–আমার কাজটা অন্যায় হয়েছে। দিব্যেন্দুর সঙ্গে মার বিয়েতে আমি আপত্তি করিনি ও কখনও আমার ওপর বাবাদের মতো কর্তৃত্ব করবে না বলে । সত্যি কথা বলতে কী এখন পর্যন্ত করেনি। সেই রাতে হরর ছবি দেখতে দেখতে মনে হয়েছিলো দিব্যিন্দু বুঝি আগের জায়গা থেকে সরে যেতে চাইছে।

ছবির দিকে মন না থাকলেও দিব্যেন্দু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো টেলিভিশনের দিকে। মনে হলো ও আমাকে উপেক্ষা করছে। কথাটা ভাবতে গিয়ে কষ্ট হলো আমার। বুকের ভেতরটা ভারি মনে হলো। ওকে বললাম, তুমি আমাকে বন্ধু বলেছো বলেই জানতে চেয়েছিলাম তোমাদের ভেতর কী হয়েছে। এটা যদি তুমি অনধিকার চর্চা মনে করো–ঠিক আছে এ ধরনের কথা আর কখনও বলবো না।

আমি আশা করছিলাম দিব্যেন্দু বলবে, ও কিছু নয়। এমনিতেই মন খারাপ। কিংবা বলবে–তোমাকে তিনদিন দেখতে না পেয়ে আমাদের সময় খুব খারাপ কেটেছে। তুমি এসেছো, সব ঠিক হয়ে যাবে। দিব্যেন্দু কোনো কথা বললো না। আমার বুকের ভেতর কান্না জমছিলো। মনে হলো এভাবে বসে থাকলে ঠিক কেঁদে ফেলবো। আমার দুর্বলতা প্রকাশ করে আমি দিব্যেন্দুর সহানুভূমি পেতে চাই না। ওকে গুড নাইট বলে উঠে চলে এলাম।

ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুতেই রাগ আর অপমানে আমার কান্না এলো। দিব্যেন্দু আমাকে এভাবে উপেক্ষা করবে আমি ভাবতেই পারছিলাম না। অথচ আমি কিছুই করিনি। কথাটা যতবার ভাবলাম ততবারই কেঁদে বালিশ ভেজালাম।

বাইরে থেকে সবাই বলে আমি নাকি খুব হাসিখুশি স্বভাবের। সারাক্ষণ সবাইকে মাতিয়ে রাখি। বন্ধুরা শুধু নয়, বড়রাও আমাকে পছন্দ করে আমার এই স্বভাবের জন্য। বন্ধুদের সঙ্গে আমি আমার আনন্দ শেয়ার করি, কিন্তু আমার কষ্ট শেয়ার করি না। কেউ আমাকে দেখে কখনও বুঝতে পারবে না প্রিয় কারও উপেক্ষায় আমি কী প্রচণ্ড কষ্ট পাই। একবার শীলা আমার সঙ্গে ডেট করে এক টার্কিশ ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলো প্রোগ্রাম বাতিল না করে। দেখা হওয়ার পর অবশ্য সরি বলেছে। তখন আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম। অথচ শীলাকে এতটুকু বুঝতে দিইনি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। শীলা অবশ্য পরে বলেছে, আমার খুব খারাপ লেগেছিলো নিক। মেহমেট তোমার মতো নয়। ওর সঙ্গে আমি আর

কোথাও যাবো না। শীলা যদি একথা না বলতে আমার সব সময় মনে হতো ও আমাকে উপেক্ষা করেছে।

সে রাতে আমি অনেকক্ষণ কেঁদেছিলাম। পরে ঠিক করলাম মার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবো। মা নিশ্চয় দিব্যেন্দুকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে না। এক সময় মনে হলো দিব্যেন্দুর জায়গায় আমার নিজের বাবা থাকলে আমাকে এভাবে অবহেলা করতো না।

পরদিন আমার স্কুল ছিলো না। তখনও স্কুল খুলতে সাতদিন বাকি। সকালে নাশতার টেবিলে দিব্যেন্দুর সঙ্গে মার কিছু খুচরো কথা হলো রেডিওর এক প্রোগ্রাম নিয়ে। অনুবাদ বিভাগে নতুন এক মেয়ে এসেছে, ওর নাকি অনুবাদ ঠিক হয়নি। দিব্যেন্দু মাকে বললো সেই মেয়েকে সাহায্য করার জন্য। আমি ভেবেছিলাম দিব্যেন্দু গতরাতের ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করবে। ও কিছুই করলো না। মাকে নিয়ে বেরোবার সময় শুধু বাই অনীক বলে চলে গেলো। ওর ওপর আমার খুব রাগ হচ্ছিলো। আগামীকাল শনিবার। ও যদি দয়া করে মাকে রেখে কোথাও যায় তবেই মার সঙ্গে একা কথা বলতে পারবো। আমার মন বলছিলো এ উইকএণ্ডে ও একাই বেরোবে।

দিব্যেন্দু আর মা চলে যাওয়ার পর গোটা বাড়িতে আমি একা। আমাদের বাড়িটার মালিক হচ্ছে এক বুড়ি মহিলা। মা অনেকবার কিনতে চেয়েছিলো, বুড়ি রাজি হয়নি। নিজেও অন্য জায়গায় ভাড়া থাকে, বলে এ বাড়ি হাতছাড়া করবে না। এ বাড়িটা একটু পুরোনো ধরনের হলেও বেশ আরামের। নিচে ড্রইং, ডাইনিং কিচেন আর লিভিংরুম। ওপরে তিনটা বেডরুম। একটা মা আর দিব্যেন্দুর, একটা আমার, আরেকটা অতিথিদের জন্য। বাড়িটার বাইরের দেয়াল পাথরের, ভেতরে ঘরের মেঝে আর সিঁড়ি কাঠের। সামনে কোনো জায়গা নেই, পেছনে বেশ বড় একখানা বাগান আছে। বাগানে দুটো আপেল গাছ আর একটা চেস্টনাট ছাড়া বড় গাছ নেই। কয়েকটা চিরসবুজ জাতীয় ছোট গাছের ঝোঁপ আছে। এপ্রিলে শীত চলে গেলে চারা বোনা হয়। পুরোনো টিউলিপ বেডগুলো মে মাস নাগাদ লাল, সাদা, বেগুনি টিউলিপে ঝলমল করে ওঠে। তখন থেকে মাসে একবার ঘাস ছাঁটতে হয়, সপ্তায় একবার শুকনো পাতা পরিষ্কার করতে হয়, গরমের সময় রোজ গাছে পানি দিতে হয়। বাগানের সব কাজ আমি নিজে করি। ফুল আর গাছ আমার ভালো লাগে।

একা বাড়িতে কিছুই করার নেই। শীলাকে ফোন করে পেলাম না। ভিকি আর জেনও বাড়িতে নেই। গতরাতে যে হরর ছবিটা দেখা বাকি ছিলো, কিছুক্ষণ ওটা দেখলাম। একটু পরেই একঘেয়ে মনে হলো। বুঝতে পারছিলাম এরপর কী হবে।

টেলিভিশন বন্ধ করে বাইরে বাগানে গেলাম। জানুয়ারি মাসের চার তারিখ, এখন পর্যন্ত বরফ পড়া আরম্ভ হয়নি। অন্যান্যবার ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বরফ পড়া শুরু হয়ে যায়। এবার নাকি ফেব্রুয়ারির আগে লন্ডনে বরফ পড়বে না। স্কটল্যান্ডে অবশ্য ডিসেম্বরের শুরুতেই বরফ পড়া আরম্ভ করে, এর কোনো ব্যতিক্রম হয় না। লন্ডনের আবহাওয়া খুব খামখেয়ালি। বড়রা ঠাট্টা করে বলে মেয়েদের মন যেমন বোঝা যায় না, লন্ডনের আবহাওয়াও বোঝা যায় না। বিশেষ করে শরতে আর শীতে এরকম হয়। সকালে দেখা গেলো খটখটে রোদ, মিষ্টি আবহাওয়া, কেউ ছাতা নিয়ে বেরোয়নি, দু ঘণ্টা পরই কালো মেঘে আকাশ অন্ধকার হয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে প্যাঁচপ্যাঁচে বৃষ্টি শুরু হলো। যারা আবহাওয়ার বুলেটিন শোনে তারা অবশ্য খটখটে রোদের ভেতর ছাতা, রেইনকোট, সব সঙ্গে নিয়ে তৈরি হয়ে বেরোয়। বিপদে পড়ে তারা, যারা বাড়ি থেকে বেরোবার আগে বুলেটিন শোনে না।

সেদিন আবহাওয়া ছিলো চমৎকার। ঠাণ্ডা হলেও আকাশে রোদ ছিলা, এ সময়ে যা কদাচিৎ দেখা যায়। মাঝে মাঝে শুকনো ঠাণ্ডা বাতাসে শীতের ধার থাকলেও বিরক্তিকর ছিলো না। কিছুক্ষণ একা বাগানে হাঁটলাম। আপেল গাছের গোড়ায় ছোট্ট একটা গর্ত চোখে পড়লো। গত রোববারে বাগান পরিষ্কার করার সময় ওটা দেখিনি। বুকের ভেতরটা খচ করে উঠলো। ইঁদুরের গর্ত হলে ভয় নেই, বীভার বা ওই জাতীয় কিছু হলে আপেল গাছের শেকড় কেটে ফেলবে। এই আপেল গাছটা মা আর আমার দুজনেরই খুব প্রিয়। চমৎকার রঙ আর মিষ্টিও অনেক। অক্টোবর, নভেম্বর আর ডিসেম্বরে গাছতলায় আপেল পড়ে লাল হয়ে থাকে। মা বলে এই আপেল গাছ দেখলে নাকি গ্রামের বাড়ির কথা মনে হয়। মার গ্রামের বাড়িতে দুটো সিঁদুরে আমগাছ আছে। কালবৈশাখির ঝড়ের পর গাছতলায় টুকটুকে লাল আম এভাবে পড়ে থাকে। আমার আর মার প্রিয় আপেল গাছের গোড়ায় কোন পাজি জন্তু এভাবে গর্ত করেছে খুঁড়ে দেখতে হবে। মনটা ভালো ছিলো না, আপেল গাছের গোড়ায় গর্ত দেখে আরও খারাপ হয়ে গেলো।

### ৩. আলফ্রেডের সঙ্গে পরিচয়

মন ভালো থাকলে বাড়িতে একা থাকা আমার জন্য কোনো সমস্যা নয়। আমার একটা পার্সোনাল কম্পিউটার আছে। ওটাকে পার্টনার বানিয়ে গেম খেলি। আমার কাছে প্রায় একশ গেমের প্রোগ্রাম আছে। কয়েকটা গেম আছে মহাশূন্য অভিযানের ওপর। খেলতে বসলে সময় কীভাবে কাটে টেরও

পাওয়া যায় না। এমন উত্তেজনাকর খেলা যে নাওয়া খাওয়া ভুলিয়ে দেয়। মা অবশ্য দুতিন ঘণ্টার বেশি এসব গেম খেলা পছন্দ করে না। নাকি ব্রেনের নার্ভের ওপর চাপ পড়ে, চোখের জন্যও ভালো নয়।

সেদিন আমার কিছুই ভালো লাগছিলো না। ঠিক করলাম শহর থেকে দূরে কোথাও গিয়ে দিনটা কাটাই। ঘরে গিয়ে কাপড় পাল্টে শীতের জন্য তৈরি হয়ে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এরকম আমি মাঝে মাঝেই করি। ট্রেনে চেপে উঠে বসি। অচেনা কোনো গ্রামের স্টেশনে হঠাৎ করে নেমে পড়ি। ঘুরতে থাকি উদ্দেশ্যবিহীন। ক্লান্ত হলে রেস্তোরাঁয় বসে হ্যামবার্গার আর কফি খাই। বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়। একবার এক জিপসী মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলাম। জোর করে ওদের তাঁবুতে নিয়ে গেলো। খাওয়ালো। পালকের একটা টুপি উপহার দিলো। নাকি আমাকে দেখে ওর হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের কথা মনে পড়েছিলো।

ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে পশ্চিমের এক ট্রেনে উঠে বসলাম। সকাল তখন পৌনে দশটা। এ সময় সবাই লন্ডনের দিকে আসে, যায় খুব কম। আমি যে কামরায় বসেছিলাম সেখানে আমি ছাড়া একটা কাপ ছিলো, বসেছে বেশ দূরে। জানালার কাছে বসে ছুটে যাওয়া বিবর্ণ সবুজ মাঠ, ন্যাড়া গাছপালা আর ধূসর নীল আকাশ দেখছিলাম। বুকের ভেতরটা ফাঁকা মনে হচ্ছিলো। যেন এ পৃথিবীতে আমার কেউ অচেনা কোরস্তোরায় বলে জিপসী মেয়ের নেই। এভাবে কোনো অচেনা স্টেশনে গিয়ে যদি হারিয়ে যাই, মনে হলো কারও কিছু আসবে যাবে না। দিব্যেন্দুর অবহেলা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না।

ভিক্টোরিয়ার পরের স্টেশনে একজন বয়স্ক লোক উঠলো আমার কামরায়। চেহারাটা খুব অমায়িক, চোখ দুটো শিশুর মতো সরল আর কৌতূহলী। আমার কাছে এসে বললো, দয়া করে তোমার কাছে বসার অনুমতি দেবে?

কামরায় এতসব খালি জায়গা থাকতে আমার পাশে কেন বুড়ো বসতে চাইছে বুঝলাম না। চেহারা দেখে অবশ্য সন্দেহজনক কিছু মনে হয় না। তারপরও আমি একা থাকতে চাইছিলাম। অনিচ্ছার সঙ্গে বললাম, দয়া করে বসুন।

গায়ের ওভারকোটটা খুলে ওপরের বাঙ্কে রেখে বুড়ো আমার মুখোমুখি বসলো। বয়স ষাটের মতো হবে, পোশাক পরিচ্ছদে মনে হয় আর্থিক অবস্থা খারাপ নয়, তবে অমনোযোগী। টাইয়ের সঙ্গে যেমন কোটের রঙ ম্যাচ করেনি। তা ছাড়া চেহারাটা খুবই ইনোসেন্ট। এসব দেখার জন্য আমার দশ

সেকেন্ডের বেশি সময় লাগেনি। দেখা শেষ হলে আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ট্রেন ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে।

একটু পরে আলাপ জমাবার জন্য বুড়ো প্রথমে বললো, আজকের আবহাওয়াটা খুব চমৎকার তাই না ইয়ং ফ্রেন্ড?

হাঁ, এ সময় এত ভালো আবহাওয়া সাধারণত হয় না। দ্রভাবে জবাব দিলাম আমি।

বুড়ো হাসিমুখে বললো, আমার নাম আলফ্রেড। কটনউড যাচ্ছি। তুমি?

আলফ্রেডের বাড়িয়ে দেয়া হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললাম, আমার নাম নিক।

তুমি কদুর যাবে নিক? হাসিমুখে জানতে চাইলো কৌতূহলী আলফ্রেড।

ওর হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকেও ভদ্রতার খাতিরে সামান্য হাসতে হলো। বললাম, এমনি বেড়াতে বেরিয়েছি।

নিশ্চয় তোমাদের স্কুল এখনও খোলেনি।

আপনি ঠিক ধরেছেন।

কোনো গন্তব্য না থাকলে বেড়াবার জন্য কটনউড জায়গাটা ভারি চমৎকার। ছশ বছরের পুরোনো একটা পাথরের দুর্গ আছে ওখানে।

আপনার বাড়ি বুঝি কটনউডে?

না, না! আঁতকে ওঠার ভান করে আলফ্রেড বললো, আমাকে দেখে কি তোমার মনে হচ্ছে আমি একজন অর্ধসভ্য ইংরেজ?

আলফ্রেডের ইংরেজি উচ্চারণ লন্ডনের আদি বাসিন্দাদের মতো জড়ানো নয়, বরং শিক্ষিত এশিয়ানদের মতো পরিষ্কার। একটু অবাক হয়ে বললাম, আপনি কি ট্যুরিস্ট, ইউরোপ থেকে এসেছেন? ওর চেহারা অবশ্য পুরোপুরি ইউরোপিয়ান।

আলফ্রেড হেসে বললো, আমার বাড়ি ওয়েলস-এ। লন্ডনে মাসে একবার ঘুরতে আসি। তুমি নিশ্চয় ইন্ডিয়ান?

না, বাংলাদেশের! আমাকে কেউ ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানি বললে আমি বিরক্ত বোধ করি।

আ-আ-হ বাংলাদেশ! বুড়ো গদগদ হয়ে ভললো, সেভেন্টি সিক্স-এ আমি ঢাকা গিয়েছিলাম জাপান যাওয়ার পথে। ঢাকায় তিনদিন ছিলাম। ভারি সুন্দর জায়গা, খুব শান্ত আর নিরিবিলি শহর। তুমি কি ঢাকায় থাকো?

না, আমি লন্ডনে থাকি। আমার জন্ম হয়েছে বাংলাদেশের সিলেটে।

আমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো।

কীভাবে?

তোমার ইংরেজি বলার ধরন দেখে। তুমি একেবারে লন্ডনের লোকদের মতো ইংরেজি বলো। লন্ডনের বাসিন্দা না হলে এটা সম্ভব নয়।

আমি বাংলাও ভালো বলতে পারি।

সেটা যাচাই করা আমার সাধ্যের বাইরে। বলে হা হা করে গলা খুলে হাসলো আলফ্রেড।

আমি টের পাচ্ছিলাম আলফ্রেডের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমার বুকের ভেতর চেপে থাকা গুমোট ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। মনটা হালকা হালকা লাগছে।

আলফ্রেড হাসিমুখে বললো, এবার বলো নিক, তুমি কি আমার সঙ্গে কটনউড যাচ্ছো বেড়াতে? আমি প্রায়ই যাই। দুর্গের পাশে ছোট্ট একটা নদী আছে। নদীর পাশে দুশ বছরের পুরোনো একটা রেস্তোরাঁ আছে। ইচ্ছে করলে নদীতে নৌকা নিয়েও বেড়ানো যায়। যাবে তো?

তুমি যেভাবে লোভ দেখাচ্ছো না গিয়ে উপায় কী!

আলফ্রেড উচ্ছ্বসিত গলায় বললো, তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পেলে বেড়াতে আমার দারুণ ভালো লাগবে।

ধন্যবাদ আলফ্রেড। তুমি একজন চমৎকার মানুষ।

প্রশংসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ নিক। আমার ভেতর ভালো যদি কিছু থাকে সেটা ওয়েলস-এর আলো বাতাস আর প্রকৃতির জন্য। ওয়েলস-এর লোকেরা সবাই হাসিখুশি, বন্ধুবৎসল। ইংল্যান্ডের লোকদের মতো গোমড়ামুখো অসভ্য নয়।

এটা আমি লক্ষ্য করেছি স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড বা ওয়েলস-এর লোকেরা ইংল্যান্ডের লোকদের সব সময় অসভ্য আর গোমড়ামুখো বলে। ইংল্যান্ডের লোকেরা তাদের বলে অমার্জিত গেঁয়ো। কারও সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করাটা যদিও অভদ্রতা তবু আলফ্রেড এত সরলভাবে কথাটা বললো যে ওকে কিছু বলতে পারলাম না। আলফ্রেড বললল, লন্ডনে তোমার কে আছে?

মা আর সৎ বাবা।

তুমি কি ওদের সঙ্গে থাকো?

আমি মাথা নেড়ে সায় জানালাম। আলফ্রেড বললো, তোমার বাবা নিশ্চয় খুব ভালো লোক। এসব ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আমার সৎ বাবা ঠিক বাবার মতো নয়, আমার বন্ধুর মতো। আমাকে ও খুব ভালোবাসে।

তুমিও নিশ্চয় ওকে খুব ভালোবাসো?

হাঁ, ভালোবাসি। ভালোবাসা একতরফা হয় না।

তুমি ভাগ্যবান নিক। তোমার সৎ বাবাও খুব ভাগ্যবান–তোমার মতো ছেলে পেয়েছে।

তোমার নিজের কথা বলো। বাড়িতে কে কে আছে তোমার?

আলফ্রেড ওয়েলস-এর বাসিন্দা বলেই ওকে এভাবে প্রশ্ন করেছিলাম। নইলে এটা নিতান্তই অ-ইংরেজসুলভ প্রশ্ন, যা কোনো দ্র ইংরেজ কাউকে করবে না।

ওয়েলস-এর বাড়িতে আমি একা থাকি। আলফ্রেড-এর মুখের হাসিতে কিছুটা বিষণ্ণতা মেশানো ছিলো।

তোমার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে নেই?

স্ত্রী মারা গেছে। দুই ছেলে আছে, এক ছেলে লন্ডনে, আরেক ছেলে আছে। ব্রাসেলস এ।

লন্ডনে তোমার ছেলের সঙ্গে থাকে না কেন তুমি?

একটু বিরক্ত হয়ে আলফ্রেড বললো, ও এক ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করেছে। জানোই তো ইংরেজরা স্বাধীনভাবে থাকতে পছন্দ করে।

আলফ্রেডের কথা শুনে ওর জন্য ভারি মায়া হলো। বললাম, আমাদের বাংলাদেশে, শুধু বাংলাদেশে নয়, এশিয়ার অনেক দেশে বাবা মা বুড়ো হলে ছেলেদের সঙ্গে থাকে। ছেলের বউ বুড়ো বাবা মার যত্ন নেয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলফ্রেড বললো, আমি জানি নিক। রবার্ট যদি ওয়েলস এর মেয়ে বিয়ে করতো তা হলে আমরা একসঙ্গে থাকতে পারতাম। এ্যান একেবারে খাঁটি ইংরেজ। ও এসব পছন্দ করে না।

শুধু মেয়ের দোষ দিও না। তোমার ছেলেও নিশ্চয় এর জন্য দায়ী?

তা তো বটেই! বলে আলফ্রেড চুপ করে রইলো।

আধ ঘণ্টা পর কটনউড স্টেশন এসে ট্রেন থামলো। ছোট্ট পাহাড়ি জনপদের ভেতর নিরিবিলি স্টেশন–যেমনটি আমি চেয়েছিলাম। আলফ্রেড ওর চেহারা থেকে বিষণ্ণতার কালো ছায়া সরিয়ে ফেলে ব্যস্ত গলায় বললো, জলদি নেমে পড়ো নিক। ট্রেন এখানে মাত্র এক মিনিটের জন্য থামে।

মাত্র আমরা দুজনই ছিলাম কটনউডের যাত্রী। প্লাটফর্মে নামতেই হুশ করে ট্রেনটা ছুটে গেলো। অদ্ভুত এক নিরবতা আমাদের চারপাশে দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে গেলো। স্টেশনের এক পাশে লোকালয় অন্যদিকে ধু ধু মাঠ। বেশ দূরে মাঠে একটা গরু হাম্বা বলে ডাকলো। একটা দুটো পাখির ডাক শোনা গেলো। আলফ্রেড উত্তর দিকে আঙুল তুলে দেখালো, ওই যে পাহাড়টা দেখছো, ওটার আড়ালে সেই দুর্গটা রয়েছে। আগে চলো এক কাপ চা খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিই। আমার ফ্লাস্কটাও ভরিয়ে নেবো। তারপর দুর্গ অভিযানে বেরোনো যাবে।

আলফ্রেডের কথা শুনে মনে হলো, একটু চা হলে ভালোই লাগবে। ওর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম স্টেশন থেকে। স্টেশনের কাছাকাছি রাস্তার দুপাশে কয়েকটা পাকা বাড়ি, ছোট দুটো ডিপার্টমেন্ট শপ, পাশে ক্যাফেও রয়েছে। ক্যাফেতে ঢুকে আলফ্রেড চায়ের অর্ডার দিলো। বললো, আর কিছু খাবে?

আমি মাথা নাড়লাম–না ধন্যবাদ, তুমি ইচ্ছে করলে নিতে পারো।

আলফ্রেড বললো, আমার মতো বুড়োদের অনেক হিসেব করে চলতে হয়। আমি একটার আগে কিছু খাবো না। এখন মাত্র এগারোটা দশ।

চা খেয়ে দুজন বেরিয়ে পড়লাম দুর্গের পথে। পাহাড়ি উঁচুনিচু রাস্তা, পাথরে বাঁধানো। দুপাশে বেশির ভাগ গাছেই পাতা নেই, যেগুলোতে আছে তাও বিবর্ণ, বসন্তের জন্য অপেক্ষা করছে। বসন্তের শুরুতে গাছে গাছে রঙের বন্যা বয়ে যায়। কোনো কোনো গাছ রোজ রঙ বদলায়। বনের ভেতর রঙের ফোয়ারা ছোটে।

চারদিক ঠাণ্ডা, সুনসান। মাঝে মাঝে কনকনে বাতাস বয়ে যাচ্ছিলো. গাছের শুকনো পাতায় ছোট ছোট ঘূর্ণি তুলে। শীতকালে এসব জায়গায় কোনো পাখি থাকে না। তখনও বরফ পড়েনি বলে পাহাড়ের বনে একটা দুটো পাখি উড়তে দেখা গেলো । আলফ্রেড বললো, বহু বছর পর ইংল্যান্ডের আবহাওয়া আমাদের ওয়েলস-এর মতো মনোরম মনে হচ্ছে।

তার মানে তুমি বলতে চাইছো ক্রিসমাসে তোমাদের ওখানে বরফ পড়ে না?

মাঝে মাঝে পড়ে। তবে ইংল্যান্ডের মতো নোংরা ময়লা বৃষ্টি থাকে না। শীতের শুরুতে এখানকার মতো জঘন্য আবহাওয়া কোথাও খুঁজে পাবে না।

কারও সঙ্গে কথা বলার জন্য আবহাওয়া একটা জনপ্রিয় বিষয়। তা সে ইংল্যান্ডেরই হোক কিংবা স্কটল্যান্ডের কি ওয়েলস-এর, তাতে কিছু যায় আসে না। আলফ্রেডের সঙ্গে কটনউডের পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটতে ভালোই লাগছিলো। ও এক মনে ওয়েলস-এর প্রকৃতির বর্ণনা দিচ্ছিলো। কোন ঋতুতে কী রকম

দেখায় গড়গড় বলে যাচ্ছিলো। বুড়ো কথা বলার সঙ্গী পেয়ে ভেতরের সব উচ্ছ্বাস উজাড় করে দিচ্ছে। মানুষ কী নিঃসঙ্গ! আমাকে না পেলে ও নিশ্চয় একা একা হেঁটে বেড়াতো কটনউডের রাস্তায়, নইলে পাব–এ কিংবা রেস্তোরাঁয় বসে ঝিমাতো।

নিজের কথা মনে হলো। আমি আলফ্রেডকে নিঃসঙ্গ ভাবছি, আমি নিজেও কি নিঃসঙ্গ নই? দিব্যেন্দুকে ভেবেছিলাম আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। কাল ওর কথা শুনে মনে হলো না ও আমার মতো ভাবে। শীলা, জেন, ভিকি–সবারই নিজেদের আলাদা জগৎ আছে। ওরা কোথায় গেছে আমি জানি না। জানাবার দরকারও মনে করেনি ওরা। ওদের কারও সঙ্গে দেখা হলে এভাবে অচেনা জায়গায় ঘুরতে আসতাম না। আলফ্রেডের সঙ্গে দেখা না হলে আমাকেও কটনউড না হলে অন্য কোথাও একা একা হাঁটতে হতো।

আলফ্রেড কথা থামিয়ে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছিলো–সত্যি দারুণ না! হ্যাঁ সত্যিই দারুণ। ওয়েলেস-এর সব কিছুই দারুণ চমৎকার। এ বিষয়ে ওর সঙ্গে একটু পরপরই আমাকে একমত হতে হচ্ছিলো। মনে মনে বললাম, আলফ্রেড তুমি মানুষটাও চমৎকার।

কটনউডের দুর্গটা খুব বড় নয়। কাছে না এলে বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই যে এখানে এত পুরোনো একটা দুর্গ আছে। দুর্গ দেখতে এসে লক্ষ্য করলাম এখানে কোনো গাইড নেই, পাহারাদার নেই, আশেপাশে লোকজনের কোনো চিহ্ন নেই। এমন তো হওয়ার কথা নয়! লন্ডনের আশে পাশে একশ মাইলের ভেতর অনেকগুলো দুর্গ আর প্রাসাদ আমার দেখা আছে। যেগুলো দু তিনশ বছরের পুরোনো সেগুলো সব চমৎকার টুরিস্ট স্পট আর হোটেল হয়ে গেছে। বেশি পুরোনো যেগুলো পাঁচশো বছর বা তার চেয়ে বেশি, সেগুলো জাদুঘর বানানো হয়েছে। টিকেট কেটে ঢুকতে হয়। কোনো লর্ড, ডিউক কিংবা রাজার দুর্গ। ভেতরে তাদের আসবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, সব সাজানো আছে। বেশির ভাগের বিবরণও লেখা থাকে। বিশেষ করে মূল্যবান রত্ন যদি হয়, সেগুলো কোত্থেকে কীভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে সব কিছু লেখা থাকে। বৃটেনের ইতিহাস জানার জন্য এসব দুর্গ দেখা যে খুব দরকার আমাদের টিচাররা বহুবার বলেছেন। অথচ কটনউডে এরকম একটা দুর্গ এভাবে পড়ে আছে দেখে রীতিমতো অবাক হলাম।

আলফ্রেডকে বললাম, তুমি কি সত্যিই জানো এটা ছশ বছরের পুরোনো দুর্গ।

সংস্কারের অভাবে দুর্গটাকে অবশ্য আরও পুরোনো মনে হচ্ছিলো। বাইরের দিকটা কালো গ্রানাইট পাথর দিয়ে বানানো হলেও দেয়ালে ফাটল ধরছে, কোথাও দেয়ালের গায়ে বুনো ঝোঁপ গজিয়ে

শুকিয়ে আছে, দরজা জানালার সংখ্যা খুবই কম যদিও, সেখানে শুধু ফোকরই আছে কোনো আড়াল নেই। রীতিমতো হন্টেড ক্যাস্-এর মতো মনে হচ্ছিলো। বুঝি রাত নামলেই কালো বাদুড়েরা চারপাশে উড়বে আর অন্ধকার ফোকর দিয়ে কালো আলখাল্লা পরা কোনো ভ্যাম্পায়ার বেরিয়ে আসবে।

আমার সন্দেহের কথা শুনে আলফ্রেড হাসলোকেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি! সঠিক সময় যদি জানতে চাও তা হলে বলি, তেরশ আশি সালে বার্গান্ডির ডিউক এ দুর্গটা বানিয়েছিলো তাদের জমিদারী রক্ষা করার জন্য। খুবই অত্যাচারী ছিলো বার্গান্ডির জমিদারেরা। কত প্রজাকে যে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতেছে তার কোনো হিসেব নেই। তাদের অত্যাচারের কথা নিয়ে অনেক ব্যালাড লেখা হয়েছে। এই এলাকার পুরোনো লোকেরা এখনও ভ্যালেন্টাইনের মেলার সময় সেসব ব্যালাড গায়।

এভাবে অযত্নে ফেলে রেখেছে কেন? আলফ্রেডকে প্রশ্ন করলাম–এর চেয়ে অনেক কম পুরোনো দুর্গগুলো হয় জাদুঘর নয়তো হোটেল বানানো হয়েছে।

পুরোনো বটে তবে এটার কোনো ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই। জমিদাররা শুধু বছরে একবার খাজনা আদায়ের জন্য আসতো। তাদের কর্মচারীরা থাকতো এখানে। স্থাপত্য নির্দশনের কথা যদি বলো সেদিক থেকে এটা আহামরি কিছু নয়। আমাদের ওয়েলস-এ এরকম অনেক দুর্গ এমনি পড়ে আছে। দেখার কেউ নেই।

আমরা দুজন বসেছিলাম কালো একটা পাথরের বেঞ্চে। হাতব্যাগের পকেট থেকে মোটা একটা পাইপ বের করে ওটার ভেতর তামাক ভরলো আলফ্রেড। তামাকের কৌটোর গায়ে লেখা থ্রি নান। পাইপে আগুন ধরিয়ে ওটা টানলো সে। ওর মুখে গভীর তৃপ্তি ছড়িয়ে পড়লো। একগাল সুগন্ধি ধোয়া ছেড়ে আলফ্রেড বললো, তোমাকে একটা প্রস্তাব দিতে চাই নিক।

কী প্রস্তাব? অবাক হয়ে জানতে চাইলাম আমি।

ওয়েলস-এ আমার একটা চমৎকার বাড়ি আছে। তুমি কি আমার সঙ্গে দুদিনের জন্য সেখানে বেড়াতে যাবে?

.

**৪. দুর্লভ বন্ধু আলফ্রেড**

ঘড়িতে তখন ঠিক সাড়ে বারোটা। সূর্য যদিও মাথার কাছে এসে পড়েছে রোদে এতটুকু তেজ নেই। মাঝে মাঝে কনকনে বাতাসে গাছের শুকনো ঝরা পাতা এলোমেলো উড়ছিলো। গাছের পাতার সামান্য খসখস শব্দ ছাড়া কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। আমার চারপাশে থ্রি নান তামাকের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে

রয়েছে। আলফ্রেড এক মনে পাইপ টানছিলো। ওর সঙ্গে মাত্র দুঘন্টা আগে পরিচয়। কোনো ইংরেজ যদি কাউকে দুঘন্টার পরিচয়ে তাকে তার গ্রামের বাড়িতে যেতে বলে এর চেয়ে আশ্চার্যের আর কিছু হতে পারে না। আলফ্রেড ইংরেজ নয়। তবু এত অল্প পরিচয়ে আমাকে ওর বাড়িতে যেতে বলছে দেখে খুবই অবাক হলাম। ওকে বললাম, আলফ্রেড, আমি তোমার বাড়িতে যাবো কি না সেটা এখনই বলতে পারছি না। তুমি আমাকে এত অল্প পরিচয়ে তোমার বাড়িতে যেতে বলছে–এতে আমি বেশ অবাক হয়েছি।

পাইপ টানা বন্ধ করে আলফ্রেড আমার মুখের দিকে তাকালো। ওর চোখে কৌতুকের ঝিলিক, যেন আমি খুব মজার কথা বলেছি। বললো, আমার বয়স কত বলো তো?

ষাটের মতো হতে পারে।

আমার বয়স বাহাত্তর।

তোমাকে দেখে মনে হয় না এত বয়স হয়েছে।

প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ।

তুমি আমার কথার জবাব দাওনি।

দেখ নিক, এ বয়সে আমি মানুষ কম দেখিনি। তোমাকে বলেছি বোধহয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমার পোস্টিং ছিলো ইন্ডিয়াতে। পাঁচ বছর ছিলাম সেখানে। ইন্ডিয়ানদের আমি ভালোমতো চিনি। তা ছাড়া কোনো মানুষকে চিনতে আমার বেশি সময় লাগে না। লোকটা ভালো না মন্দ, ওর মনটা কেমন–এসব আমি এক ঘন্টার আলাপেই বুঝতে পারি।

আমার সম্পকে তোমার ধারণা কী?

তোমাকে আমি বলেছি, তুমি খুব ভালো ছেলে। তোমার বাবা, মা সবাই ভালো। তোমাকে যা বলিনি সেটা হচ্ছে তোমার মনের অবস্থা । যে কোনো কারণেই হোক আজ তোমার মন ভালো নেই। তুমি নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ ভাবছে।

কী করে বুঝলে?

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, আমার পাঠ্য বিষয়ের তালিকায় মনোবিজ্ঞান ছিলো। বিষয়টা এমনিতেও আমার প্রিয়। এ নিয়ে যথেষ্ট পড়েছি, মানুষের চরিত্র বোঝারও চেষ্টা করেছি। এত বছরের অভিজ্ঞতা একেবারে মিথ্যা হতে পারে না।

আমি তোমাকে এমন কোনো কথা বলিনি যাতে মনে হতে পারে আমার মন ভালো নেই।

বলোনি। কিন্তু আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এমন চমৎকার দিনে তোমার বয়সী ছেলেরা বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করে কাটায়। তোমার মতো কেউ একা এভাবে অজানা গন্তব্যে পাড়ি জমায় না। আমার সঙ্গে কটনউড আসতে রাজি হলে, কারণ তোমার সহৃদয় কারও সান্নিধ্য প্রয়োজন ছিলো। তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় লক্ষ্য করেছি তুমি বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলে। একবার দারুণ মজার একটা হাসির ঘটনা তোমাকে বললাম, সত্যিই দারুণ না! তুমিও বললে সত্যিই দারুণ। যদি জিজ্ঞেস করি কী ছিলো দারুণতুমি বলতে পারবে না। তুমি অন্য কিছু ভাবছিলে। তোমার মনটা বিক্ষিপ্ত ছিলো।

আলফ্রেডের কথায় আমি বিব্রত বোধ করলাম। ও এমনভাবে কথা বলছিলো যেন। আমার মনের সব খবর ওর জানা হয়ে গেছে। বিব্রত গলায় বললাম, আলফ্রেড, তোমার কথার সময় আসলেই আমি অমনোযোগী ছিলাম। তুমি শুরু করেছিলে ওয়েলস-এর গল্প দিয়ে। আমি তখন ভাবছিলাম আমার মার কথা। কাল রাতে মাকে আমি বিমর্ষ দেখেছি। আমার সৎ বাবা দিব্যেন্দুরও মন ভালো ছিলো না। কেন যেন মনে হচ্ছে আমি বোধহয় ওদের মন খারাপের কারণ। বুঝতে পারছি না কী করবো। আমার অমনোযোগকে উপেক্ষা ভেবো না। তোমার সঙ্গে থাকতে আমার ভালো লাগছে।

আমার কথা শুনে আলফ্রেড কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বললো না। চুপচাপ তাকিয়ে থাকলে আমার মুখের দিকে। তারপর নরম গলায় বললো, বয়সে আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছো এমনভাবে যেন আমি তোমার সমবয়সী কেউ। এতে বোঝা যায় তোমার মনটা কত নিষ্পাপ। নিক, তুমি কি আমাকে বলবে কাল রাতে কী হয়েছিলো?

কথাগুলো আলফ্রেড এমনভাবে বললো, যেন ও আমার অনেক দিনের পুরোনো খুব কাছের একজন বন্ধু। মনে হলো অন্য কারও সঙ্গে না হলেও ওর সঙ্গে আমার কষ্টের বোঝা ভাগ করে নেয়া যায়। যদিও আলফ্রেডের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বোঝা এমনিতে কিছুটা হালকা হয়ে এসেছিলো, ভাবলাম যদি এভাবে বোঝাটা নামিয়ে ফেলতে পারি ক্ষতি কী! ওকে বললাম কাল কী হয়েছিলো। শুধু কালকের কথা নয়, দিব্যেন্দুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, মার সঙ্গে ওর বিয়ে, ইন্ডিয়া যাওয়া, ওদের পরিবারের রক্ষণশীলতা সবই ওকে বললাম।

আমার কথা শোনার পর আলফ্রেড কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। আপন মনে পাইপ টানছিলো। আমি তাকিয়েছিলাম দুর্গের দিকে। শীতের ঝিমধরা দুপুরে জীর্ণ দুর্গটাকে খুব অসহায় মনে হচ্ছিলো একসময় কত দাপট ছিলো এই দুর্গের। কত মানুষ এটাকে দেখে ভয়ে সিটিয়ে যেতো। এখন কেউ জানেও না

এটার কথা। অযত্নে অবহেলায় এভাবে ধীরে ধীরে একদিন মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। সে মাটিতে ঘাস গজাবে, বসন্তে ঘাসফুল ফুটবে। ছোট ছোট বাচ্চারা প্রজাপতির পেছনে ছুটোছুটি করবে। যখন একা থাকি এরকম ভাবতে আমার ভালো লাগে। মা একদিন বলেছিলেন, তুই জেগে জেগে স্বপ্ন দেখিস।

আলফ্রেড আস্তে আস্তে বললো, নিক, তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, যদি কিছু মনে না করো। আর আমাকে যদি বন্ধু ভাবতে পারো তবেই প্রশ্নের জবাব দিও।

দিব্যেন্দু আমার চেয়ে বাইশ বছরের বড় হয়ে যদি বন্ধু হতে পারে তুমি কেন পারবে না! তোমার প্রশ্ন বলো–

আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ নিক।

তোমার প্রশ্নটা কী?

দিব্যেন্দুর মা যা চেয়েছে, দিব্যেন্দু যদি ছোট্ট একটা বাচ্চার বাবা হতে চায় তুমি কি আপত্তি করবে?

একথা কেন বলছো?

আমার ধারণা তোমার মা তা চায় না। তোমার কথা ভেবেই হয়তো। তোমার মার হয়তো মনে হয়েছে তাতে তুমি নিজেকে উপেক্ষিত ভাবতে পারো। তুমি নিজে কী বলো?

আলফ্রেডের কথার জবাব কীভাবে দেবো কিছুক্ষণ ভাবতে হলো। তারপর বললাম, মা যদি সত্যিই ওরকম ভেবে থাকে তার নিশ্চয় কারণ আছে আলফ্রেড।

আমি জানি। তবু আমাদের সব সময় সব পরিস্থিতির ভেতর মানিয়ে চলা শিখতে হয়। এই যে আমার ছেলেরা আমার জন্মদিনে আর ক্রিসমাসে শুধু দুটো কার্ড পাঠিয়ে আমার প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে–এটা তো আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু তোমার মা তোমাকে কাছে পেতে চায়। দিব্যেন্দুও নিশ্চয় চায় তুমি ছোট ভাইবোনকে ভালোবাসবে। যদি তুমি এটা সহজভাবে নিতে পারো তোমার মা আর দিব্যেন্দুর ভেতর আর কোনো বিরোধ থাকবে না। আমার ধারণা তুমি আগের চেয়ে বেশি ওদের ভালোবাসা পাবে।

আমার ভয় হচ্ছে ওরা আমাকে বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দেবে।

তুমি অনেক বিষয় তোমার বয়সী ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি বোঝ। এটা কেন বুঝতে পারছে না দিব্যেন্দুর সঙ্গে তোমার মায়ের বিয়েটা যেমন তোমার ইচ্ছায় হয়েছে, তোমার ইচ্ছাতেই তোমাদের বাড়িতে নতুন অতিথি আসবে। এজন্য তোমার বাবা মা দুজনই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

কথাটা ভেবে দেখলাম, আলফ্রেড মিথ্যে বলেনি। আমি না চাইলে মার সঙ্গে দিব্যেন্দুর বিয়ে হতো না কিন্তু ওদের একটা দুঃখের কারণ হতাম আমি, যা ওরা কখনও আমাকে জানতে দিতো না। কখনও যদি আমি না চাই দিব্যেন্দু বাবা হবে না, ওর মার ইচ্ছা পূরণ হবে না, এর দায় শেষ পর্যন্ত আমাকেই নিতে হবে ।

আলফ্রেডও আবার বললো, তুমি বড় হচ্ছো নিক। এখন তুমি আরও বেশি করে নিজের জগতে জড়িয়ে যাবে। দশ বছর পর বাবা মার চেয়ে অনেক বেশি আপন মনে হবে তোমার নিজের জগৎকে। তখন ওদের কী হবে সেটাও একবার ভাবো।

তুমি ঠিকই বলেছো আলফ্রেড। আমি ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছি। বললাম, আমি খুব স্বার্থপরের মতো নিজের কথাই শুধু ভাবছিলাম। আজই মাকে বলবো–আমি ভাই পেতে চাই।

নরম হেসে আলফ্রেড বললো, তুমি মোটেই স্বার্থপর নও নিক। স্বার্থপর হলে বন্ধুদের ফেলে এমন চমৎকার দিনে আমার মতো বিটকেল বুড়োকে সঙ্গ দিতে না।

আলফ্রেডের কথার ধরনে আমি হেসে ফেললাম–কী যা তা বলছো আলফ্রেড! তুমি শুধু বন্ধু নও, তার চেয়েও বেশি কিছু। জানো, কাল সারা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। অনেক রাত পর্যন্ত কেঁদেছিলাম। নিজেকে খুব হতভাগ্য ভাবছিলাম। মনে হচ্ছিলো আমার আনন্দের দিন চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে।

আমার কাঁধে হাত রেখে আলফ্রেড বললো, তোমার মতো চমৎকার ছেলে নিজেকে কেন হতভাগ্য ভাববে? আশা করি এরপর থেকে এরকম কোনো সমস্যা হলে এ বুড়োকে স্মরণ করবে। আমি চাই চিরকাল তুমি আনন্দের জগতে বাস করবে।

ভবিষ্যতে নিশ্চয় তোমাকে স্মরণ করবো। পরিবেশটা হালকা করার জন্য বললাম, আপাতত অন্য একটি কারণে তোমাকে স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে।

কী কারণে? একটু অবাক হয়ে জানতে চাইলো আলফ্রেড।

আমি ক্ষুধার্ত। নেকড়ে বাঘের মতো ক্ষুধার্ত।

ঘড়ি দেখে আঁতকে উঠলো আলফ্রেড–হায় ঈশ্বর, দেড়টা বেজে গেছে! আমি দুঃখিত নিক, একটায় খাবো বলেছিলাম। এই বলে ব্যাগ থেকে ও স্যান্ডউইচ আর দুটো কোকের ক্যান বের করলো। স্টেশনের রেস্তোরাঁ থেকে চা খেয়ে আসার সময় এগুলো সে কিনেছিলো।

স্যান্ডউইচ খেতে খেতে বললাম, একেবারে টাটকা জিনিস। লন্ডনে এত টাটকা স্যান্ডউইচ পাওয়া যাবে না।

গ্রামের সব কিছুই টাটকা। বুক ভরে এখানকার বাতাসে নিঃশ্বাস নাও। লন্ডনে এ বাতাস কোথায় পাবো?

ওয়েলস-এর বাতাস নিশ্চয় এর চেয়েও ভালো?

আহ্ ওয়েলস! ওখানকার কোনো কিছুর সঙ্গে এখানকার তুলনা হয় না। বলতে গিয়ে গভীর তৃপ্তিতে আলফ্রেডের চোখ বুজে এলো। তারপর হঠাৎ মনে পড়াতে বললো, ভালো কথা, তুমি কি আমার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছো?

হেসে বললাম, নিশ্চয় যাবো আলফ্রেড। কবে যেতে চাও বলো?

অবশ্য তোমার স্কুল খোলার আগে। যখন খুশি যেতে পারো।

সঙ্গে যদি আমার দু তিনজন বন্ধু যেতে চায়অসুবিধে হবে?

আলফ্রেডের মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। শুকনো গলায় বললো, তোমার বন্ধুরা কি আমার মতো একজন বুড়োর সঙ্গ পছন্দ করবে?

নিশ্চয় করবে। আমাকে তোমার পছন্দ হলে ওদেরও হবে।

ওরা কি ইংরেজ?

আলফ্রেডের ভয়ের কথা জানতে পেরে হেসে ফেললাম–একজনও ইংরেজ নয়।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললোআলফ্রেড–তা হলে অবশ্যই ওদের স্বাগত জানাবো। ওর মুখে আবার হাসি ফিরে এলো অসভ্য ইংরেজ জাতটাকে দুচোখে দেখতে পারি না আমি।

আজকাল ইংরেজদের ভেতর এশিয়ানদের প্রতি ঘৃণা অনেক বেড়েছে। ওদের সম্পর্কে আমার ধারণাও খুব ভালো নয়। তবে আলফ্রেডের মতো এতটা বিদ্বেষ আমার ভেতর নেই। বললাম, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো কীভাবে?

আলফ্রেড একটা কাগজে ওর লন্ডনের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর লিখে দিলো। বললো, এটা হচ্ছে সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন অফিসারের একটা ক্লাব। লন্ডনে এলে আমি ক্লাবের গেস্ট হাউসে উঠি। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলো। যদি চাও আমরা কালই যেতে পারি।

ততক্ষণে আমাদের দুপুরের লাঞ্চ হয়ে গেছে। আলফ্রেডকে বললাম, বলেছিলে কাছে নাকি নদী আছে, নৌকায় ঘোরা যায়! এদিকে তো কোনো নদী দেখছি না।

মুখ কাঁচুমাচু করে আলফ্রেড বললো, তোমাকে লোভ দেখাবার জন্য বলেছিলাম নদী কাছে। আসলে এখান থেকে দেড় মাইল পশ্চিমে নদী। যদি হাঁটতে আপত্তি না থাকে যেতে পারি।

আজ তা হলে থাক। হেসে বললাম, তবে যে বললে ওয়েলস-এ নাকি বার্চলেকের ধারে তোমার বাড়ি! সেখানে গিয়ে আবার হ্রদ দেখার জন্য কয়েক মাইল হাঁটতে হবে না তো?

মোটেই না। ব্যস্ত গলায় প্রতিবাদ জানালো আলফ্রেড–হ্রদের পানিতে আমাদের বাড়ির ছায়া পড়ে। সত্যি বলছি নিক!

মুখ টিপে হেসে বললাম, দেখা যাবে।

দেখে নিও। হাসিমুখে বললো আলফ্রেড।

সূর্য বেশ কিছুক্ষণ আগে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। ঠান্ডা বাতাস ধীরে ধীরে বাড়ছিলো। দুর্গের বা পাশে বন, ডানদিকটা অনেকখানি খাড়া নেমে গেছে খোলা মাঠে। সামনের চত্বরে একসময়ে পাথর বিছানো ছিলো। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বুনন ঘাস আর আগাছা গজিয়ে সব ঢাকা পড়েছে। আলফ্রেডকে বললাম তুমি কখনও এ দুর্গের ভেতরে গিয়েছো?

না যাইনি। একা সাহসে কুলোয়নি। তুমি যদি সঙ্গী হও একদিন যেতে পারি। অবশ্য আমার মতো যদি ভীতু না হও।

এখন যাবে? আমি সাহস দেখাবার জন্য উদগ্রীব হলাম।

আজ বাদ দাও। তোমার সঙ্গে বসে গল্প করতে বেশি ভালো লাগছে।

আমার পুরোনো প্রাসাদ, দুর্গ এসব দেখতে ভালো লাগে।

আমাদের পাশের গ্রামে একটা অনেক দিনের পুরোনো প্রাসাদ আছে, লোকে ওটাকে হন্টেড প্যালেস বলে। দিনের বেলায়ও ওর ধারেকাছে কেউ যায় না।

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, সত্যিই বলছো আলফ্রেড! তা হলে তো দারুণ মজা হবে।

আলফ্রেড মৃদু হাসলো। কোনো কথা বললো না। বিকেল চারটা পর্যন্ত আলফ্রেডের সঙ্গে কটনউডে কাটালাম। তারপর লন্ডনের ট্রেন ধরে যখন ভিক্টোরিয়া স্টেশনে নামলাম তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। আলফ্রেড বললো, তুমি বাড়ি যাবে কিভাবে?

টিউবে চলে যাবো। তুমি আমার জন্য ভেবো না।

আমি তোমাকে তোমাদের স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেবো।

কোনো দরকার হবে না আলফ্রেড। রাত নটা দশটায় বাড়ি ফেরার অভ্যাস আছে আমার।

আলফ্রেড করুণ গলায় বললো, তোমর জন্য নয়, আমার নিজের গরজেই যেতে চাইছি। আমি আরও কিছু সময় তোমার সঙ্গে কাটাতে চাই।

ওর জন্য মায়া হলো। মাত্র পাঁচটা বাজে। মা আর দিব্যেন্দু ফিরবে সাতটা আটটার দিকে। নিরীহ গলায় বললাম, ঠিক আছে আলফ্রেড, আমার সঙ্গে যেতে পারো এক শর্তে

অবাক হয়ে ও জানতে চাইলো–কী শর্তে?

যদি আমাকে এক কাপ কফি খাওয়াও।

স্টেশন ভর্তি লোকের সামনে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলফ্রেড বললো, শুধু কফি কেন, তুমি যদি আমার সঙ্গে ডিনার করতে চাও তা হলে আরও বেশি খুশি হবো।

ডিনার পাওনা থাক। আজকের মতো কফি হলেই চলবে। এই বলে আমরা দুজন হাত ধরাধরি করে বাইরে এসে একটা কফিশপে ঢুকলাম।

কফির সঙ্গে আলফ্রেড জোর করে পেস্ট্রি খাওয়ালো। তারপর আমাকে নিয়ে গেলো পাশের ডিপার্টমেন্ট শপে। তিনতলায় উঠে গেমস সেকশনে গিয়ে কম্পিউটার গেমস-এর ক্যাটালগ নিয়ে এক পাশের সোফায় বসে বললো, এখান থেকে দশটা চমৎকার গেম বেছে দাও দেখি, যা তোমার নেই।

তুমি কি কম্পিউটার গেম পছন্দ করো!

না, একজনকে দেবো।

কী রকম দামের ভেতর চাও? গেম বাছতে বাছতে জানতে চাইলাম আমি।

দাম নিয়ে ভেবো না। খুব উত্তেজনা আর বুদ্ধির খেলা হতে হবে।

ক্যাটালগে শয়ে শয়ে গেমের তালিকা। নামের পাশে বিবরণ আর দাম লেখা আছে। গেম যত জটিল দাম তত বেশি। আলফ্রেডের বাজেট জানি না। মাঝামাঝি দামের দশটা গেম বাছলাম। ক্যাটালগ পড়ে মনে হলো আমার যেগুলো আছে তার চেয়ে অনেক ভালো। হবে না কেন, প্রতিমাসে নতুন নতুন গেম বেরোচ্ছে, অথচ গত ছমাস আমি কোনো গেম কিনিনি।

ছোট একটা গিফট প্যাকেটে দশটা ফ্লপি ডিস্ক নিয়ে আলফ্রেড ওর ব্যাগে ঢোকালো। আমার সঙ্গে টিউবে সাউথ গেট স্টেশন পর্যন্ত এলো। মোটামুটি ফাঁকাই ছিলো স্টেশন। ও যাবে উল্টো দিকে। আমি বললাম, এবার তোমাকে আমি ট্রেনে তুলে দেবো।

আলফ্রেড আপত্তি করলো না। ওপরে সংকেত দেখা গেলো দু মিনিট পর ওর ট্রেন আসছে। আলফ্রেড বললো, তুমি কিন্তু কাল সকালেই ফোন করছো?

মাথা নেড়ে সায় জানালাম। ওর ট্রেন এসে গেলো। ব্যাগ থেকে ফ্লপি ডিস্কের প্যাকেটটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে ও বললো, এটা তোমার।

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। এত দামী উপহার আলফ্রেড আমার জন্য কিনেছে ভাবতেও পারিনি!

তোমার চেয়ে আপন এ মুহূর্তে আমার আর কেউ নেই। এই বলে আলফ্রেড ট্রেনে উঠে পড়লো।

আমি একটা ধন্যবাদও জানাতে পারলাম না। জানালার ফ্রেমে ওর হাসিমাখা মুখখানা ভেসে উঠলো। হুশ করে বেরিয়ে গেলো ট্রেনটা।

**৫. হারানো দিন ফিরে পাওয়া**

সাড়ে ছটায় বাড়িতে ফিরেই ঠিক করলাম মা আর দিব্যেন্দুকে একটা সারপ্রাইজ দেবো। সাতটার সময় ফিরে এসে মা একটা সবজি আর ভাত রান্না করে। সাতদিনের রান্না করা মাছ মাংস ফ্রিজে থাকে। ওখান থেকে দরকারমতো গরম করে নেয়া হয়। আমি ঠিক করলাম মাকে আজ রান্না করতে দেবো না। আমাদের বাড়ি থেকে অল্প দূরে চমৎকার একটা ইন্ডিয়ান পাঞ্জাবীদের রেস্তোরাঁ আছে। দিব্যেন্দু আর মা দুজনেই কাবাব আর তন্দুরি খুব পছন্দ করে। মাসে একদিন আমরা ইন্ডিয়ান কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে কাবাব তন্দুরি খাই।

আমার জমানো টাকা থেকে দশ পাউন্ডের দুটো নোট তুলে নিলাম। ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় গিয়ে তিনজনের মতো কাবাব, তন্দুরি আর আলুমটরপনির ভাজা নিলাম। সেই সঙ্গে দইয়ের সালাদ। সব কিছু ওরা এক জায়গায় পার্সের প্যাকেট করে দিলো। চৌদ্দ পাউন্ড দাম পড়লো। সেখান থেকে বেরিয়ে দুই পাউন্ড দিয়ে পাঁচটা হালকা বেগুনি রঙের ব্লু মুন গোলাপ কিনলাম। এর গন্ধের তুলনা হয় না। বাড়িতে মা ওয়াইন রাখে না। কোনো অতিথি এলে অবশ্য কেনা হয়। দিব্যেন্দু রেড ওয়াইন পছন্দ করে। তবে পার্টি ছাড়া খায় না। ওর জন্য এক বোতল ইটালিয়ান রেড ওয়াইন কিনলাম। বললাম, প্রেজেন্ট করবো। ওয়াইন শপের লোকটা বোতলের গলায় সুন্দর রিবনের ফুল লাগিয়ে দিলো।

ঘরে ফিরে ডাইনিং টেবিলে সব কিছু সাজিয়ে রাখলাম। ন্যাপকিন, প্লেট, গ্লাস জায়গামতো রেখে মোমদানিতে দুটো মোমবাতি লাগালাম। গোলাপগুলো টেবিলের মাঝখানে ক্রিস্টালের ফুলদানিতে রাখলাম। সব কিছু তৈরি করার পর ডোরবেল বাজলো। ঘড়িতে তখন সাড়ে সাতটা বাজে।

আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলোম। মা আর দিব্যেন্দু ফিরেছে। মা বললো, সারাদিন কি বাড়িতে ছিলি?

বললাম, না, বেরিয়েছিলাম। দুপুরে বাইরে খেয়েছি।

দিব্যেন্দু আমাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলো। ভেতর থেকে গলা তুলে বললো, অনীক, তোমার কি কোনো গেস্ট আসবে?

আমি মুখ টিপে হেসে বললাম, হ্যাঁ আসবে।

মা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। জানতে চাইলো, কে আসবে?

তোমরা জলদি রেডি হয়ে এসো। দরকারি কথা আছে।

মা কথা না বাড়িয়ে ওপরে চলে গেলো। দিব্যেন্দু আগেই উঠে গেছে। মাঝে মাঝে আমার গেস্ট আসে বৈকি! কখনও আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে ওর বাবা মা, কিংবা স্কুলের কোনো টিচার আসে। ওরা আসার আগেই মাকে জানাই। মা দু একটা ভালো রান্না করে রাখে। দিব্যেন্দুকেও দেখেছি, আমার কোনো বয়স্ক অতিথি এলে তাকে ভালোভাবেই রিসিভ করে। টেবিলের আয়োজন দেখে ও নিশ্চয় ভেবেছে আমার কোনো ভিআইপি গেস্ট আসবে।

পনেরো মিনিট পর দিব্যেন্দু গাঢ় নীল ফর্মাল ডিনার স্যুট পরে নিচে নামলো। একটু পরে মা নামলো। পরনে-নকশি কাঁথার ডিজাইন করা খয়েরি রঙের সিল্কের শাড়ি। দিব্যেন্দু সোফায় বসে বললো, কখন আসবে তোমার গেস্ট।

মা বললো, এত সব কখন করলি? কে আসবে, কিছু তো বললি না।

বলছি। তোমরা ডাইনিং টেবিলে এসে বসো।

দিব্যেন্দু মনে হলো একটু বিরক্ত হয়েছে। উঠে এসে ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে বললো, গেস্টের জন্য জায়গা রাখোনি তো অনীক! তুমি কি আমাদের সঙ্গে বসবে না?

মা আর দিব্যেন্দু ওদের চেয়ারে বসেছে, আমাদের গোল ডাইনিং টেবিলে পাঁচজন বসতে পারে। আমি তিনজনের বসার ব্যবস্থা করেছিলাম। মোমবাতি জ্বালিয়ে আমি আমার চেয়ারে বসে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বললাম, আজ তোমরা আমার গেস্ট!

দিব্যেন্দু আর মা অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকালো। মা ভীষণ অবাক হয়ে বললো, আমরা তোর গেস্ট হবো কেন? তুই কি পাগল হয়েছিস?

পাগল কেন হবো! আমি হেসে বললাম, নাও শুরু করো। তোমাদের সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। খেতে খেতে বলছি। দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললাম, ওয়াইনটা তোমার জন্য দিব্যেন্দু।

এতক্ষণে দিব্যেন্দুর মুখে হাসি ফুটলো। মা আর ওর প্লেটের পাশে দুটো ওয়াইন গ্লাস রেখেছিলাম। আমি নিয়েছি অরেন্স জুস। বোতলের ছিপি খুলে গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে দিব্যেন্দু মাকে বললো, কী ব্যাপার বলো তো! আজ কি আমাদের কারও বিশেষ কোনো দিন?

মা বললো, আমি কী করে জানবো! ওকে জিজ্ঞেস করো।

ওদের গ্লাসে মদ ঢালার পর আমি আমার অরেঞ্জ জুসের গ্লাস তুলে বললাম, এসো টোস্ট করি।

দিব্যেন্দু আর মা ওদের গ্লাস তুললো। আমি বললাম, আগামী বছর আমি একটা ভাই নয়তো বোন পেতে চাই, সেই প্রত্যাশায়।

ওরা দুজন অসম্ভব অবাক হয়ে একবার আমাকে দেখলো, আরেকবার নিজেদের দেখলো। আমার কথা শুনে মা চমকে ওঠাতে হাত কেঁপে একটু মদ ছলকে প্লেটে পড়লো। আমি হাসি চেপে গ্লাসে চুমুক দিলাম। ওদেরও গ্লাসে চুমুক দিতে হলো। তারপর গ্লাস নামিয়ে রেখে মা বিব্রত গলায় বললো, তুই এসব কী বলছিস অনীক?

দিব্যেন্দু তখনও অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো। ওকে বললাম, আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি দিব্যেন্দু?

তোমার একথা কেন মনে হলো? প্রশ্ন করলো দিব্যেন্দু।

আমি শান্ত গলায় বললাম, ফুলদানিতে রাখা এই গোলাপগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ। এর একটা তুমি, একটা মা, একটা আমি আর দুটো আমার ভাই আর বোন।

মার গালের রঙ লাল হলো। দিব্যেন্দু গলা খুলে হাসলো। বললো, তুমি খুব পাকা কথা শিখেছো নিক। তবে কথা হচ্ছে একটা ভাই, একটা বোন এমন প্রতিশ্রুতি আমরা কেউ দিতে পারবো না। দুটো ভাই হতে পারে, দুটো বোন হতে পারে, দুটো না হয়ে একটাও হতে পারে এটা আমাদের হাতে নয়।

যাই হোক, তাতেই আমি খুশি।

দিব্যেন্দু গ্লাস তুলে বললো, এবার আমি টোস্ট করবো।

মা লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে গেছে। তবু গ্লাস তুললো। আমিও তুলোম। দিব্যেন্দু বললো, আমাদের বড় ছেলে অনীকের খুশির জন্য।

আমি হেসে বললাম, চিয়ার্স।

কাল রাতে ঠিক এ সময়ে আমাদের সবার মনের ভেতরটা কালো মেঘের অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিলো। আজ দিব্যেন্দুর হাসির সঙ্গে সেই মেঘ মুহূর্তের ভেতর উধাও হয়ে গেলো। গ্লাস নামিয়ে শান্ত গলায় দিব্যেন্দু বললো, তোমাকে ছেলে হিসেবে পেয়ে আমি গর্বিত নিক।

আমি হেসে বললাম, বাবার মতো বাবা নয়, আমি বন্ধুর মতো বাবা চাই, যেমনটি তুমি ছিলে।

তাই হবে নিক। আমি আমার কালকের দুর্ব্যবহারের জন্য দুঃখিত। অফিসে গিয়ে সারাক্ষণ বুকের ভেতর ওটা কাঁটার মতো খচখচ করেছে।

আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম দিব্যেন্দু।

আমি জানি তুমি কষ্ট পেয়েছো।

মা বললো, কিসের দুর্ব্যবহারের কথা তোমরা বলছো?

দিব্যেন্দু আমাকে চোখ টিপে বললো, ওটা আমাদের দুজনের ব্যাপার। তোমার না শুনলেও চলবে।

মোমবাতির আলোয় আমাদের এক স্মরণীয় নৈশভোজ শেষ হলো। রান্নার প্লেট বোয়ার কাজে আমিও মাকে সাহায্য করলাম। তারপর তিনজন এসে লিভিংরুমের সোফায় বসে ভিসিআর-এ কালকের না-দেখা হরর ছবিটা দেখার জন্য লাগালাম। মাকে বললাম, জানো মা, আজ এক চমৎকার মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো। আলফ্রেডের সঙ্গে পরিচয়ের কথা বললাম। মাকে আর দিব্যেন্দুকে নিয়ে ওর সঙ্গে কী কথা হয়েছে তাও বললাম। মা সব শুনে বললো, ওয়েলস-এর মানুষগুলোর মন খুব নরম হয়।

দিব্যেন্দু বললো, আমি তোমার নতুন বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে খুশি হবো নিক।

মা বললো, কাল উইকএন্ড আছে। ওকে বল কাল আমাদের সঙ্গে ডিনার করতে।

আমি উৎফুল্ল হয়ে বললাম, ও খুব খুশি হবে মা। আমি ঠিক করেছি শীলা, জেন আর ভিকিকে নিয়ে ওর গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাবো। ওদেরও কি কাল আসতে বলবো মা?

তোর বন্ধু আসবে। যাকে খুশি আসতে বলবি।

মার কথার সঙ্গে দিব্যেন্দু হেসে যোগ করলো, শুধু সংখ্যাটা আমাদের জানা থাকা দরকার।

আমাকে এতটা অবিবেচক ভাবা ঠিক হচ্ছে না দিব্যেন্দু। হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে বললাম আমি।

আলফ্রেডকে আমার মনে হচ্ছিলো জাদুকর। তার জাদুর কাঠি বুলিয়ে আমাদের তিনজনের এই পরিবারে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়েছে। মা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বললো, দিব্যেন্দু তুমি কি আরেক কাপ কফি খাবে?

আমাদের ছবি দেখা শেষ হয়ে গেছে। দিব্যেন্দু মাকে বললো, তুমি যদি খাও আমিও খেতে পারি। তারপর গলা নামিয়ে আমাকে বললো, তোমারও এক কাপ খাওয়া উচিত। ওর গলায় ষড়যন্ত্রের আভাস।

কেন? জানতে চাইলাম আমি।

কাল রাতে তোমার ভালো ঘুম হয়নি। আমরা বেডরুমে ঢুকলেই তুমি টেলিফোন নিয়ে বসবে। শীলার সঙ্গে কখনও দুঘন্টার নিচে কথা শেষ করতে পেরেছে বলে তো মনে পড়ছে না। কফি খেলে সহজে ঘুম আসবে না।

একবারই দিব্যেন্দু দেখেছিলো মাঝরাতে আমি টেলিফোনে কথা বলছি। দিব্যেন্দুকে বললাম, তার মানে তুমি রাত জেগে আমার টেলিফোন শোন। অন্যের টেলিফোনে আড়িপাতা মোটেই ঠিক নয় দিব্যেন্দু।

রাত জাগবো কেন? নিরীহ গলায় দিব্যেন্দু বললল, মাঝরাতে কেউ যদি টেলিফোনে কাউকে–কাম ব্যাক হোয়েন ইউ গ্রো আপ গার্ল গান গেয়ে শোনায়, প্রতিবেশীদের ঘুম না ভেঙে উপায় আছে!

সর্বনাশ দিব্যেন্দুটা কি পাজি! গিটারে সুরটা তুলতে পারছিলো না বলে এক রাতে ভিকিকে আমি গানের সুর বলে দিচ্ছিলাম। ও ধরে নিয়েছে আমি শীলাকে এ গান শুনিয়েছি! বললাম, আমি কক্ষনো শীলাকে এ গান গেয়ে শোনাইনি।

আমি কি একবারও বলেছি তুমি শীলাকে এ গান শুনিয়েছে!

আমি উঠে গিয়ে দিব্যেন্দুর পিঠে দুটো কিল মারলাম তুমি ভীষণ পাজি হয়েছে।

দিব্যেন্দু আমার পিঠে কুশন দিয়ে মারলো। মা দুটো কফির কাপ হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বললো, এসব কী দুষ্টুমি হচ্ছে!

কফি শেষ করে মা আর দিব্যেন্দু শুতে গেলো। আমি টেলিফোন নিয়ে বসলাম। শীলাকে প্রথমেই বকুনি দিলাম–সকালে কোথায় বেরিয়েছিলে?

আমার এক আন্টি এসেছে কায়রো থেকে। তাকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্ট গিয়েছিলাম। আমার ওপর চোটপাট কোরো না। দুপুরের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমাকে দশবার ফোন করেছি, কোনো সাড়া নেই।

আজ এক কান্ড হয়েছে। বলে আলফ্রেডের কথা ওকে বললাম, দিব্যেন্দু আর মার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে।

শীলা উত্তেজিত হয়ে বললো, তুমি সত্যিই ওয়েলস যাচ্ছো? আমার অনেক দিনের সখ ওয়েলস-এর পাহাড় আর হ্রদ দেখার।

ইচ্ছে হলে আমার সঙ্গে যেতে পারো।

নেমন্তন্ন করেছে তোমাকে। আমার যাওয়া কি ঠিক হবে?

আমার বন্ধুরাও আমন্ত্রিত। ভিকি আর জেনকেও বলবো।

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ সত্যি!

কী মজাই না হবে! কদিন থাকবে?

আলফ্রেড বলেছে যতদিন খুশি। আমি ভাবছি দিন তিনেক থাকবো।

কবে যেতে চাইছো?

পরশু, রোববার। কাল সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে তোমাদের নেমন্তন্ন আছে। আলফ্রেডও আসবে।

তোমার মা বাবা জানে?

জানবে না কেন, ওরাই তো নেমন্তন্ন করেছে।

শীলা ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখলো। জেন আর ভিকিকেও নেমন্তন্ন করলাম। ওয়েলস যাওয়ার কথা শুনে ওদের আনন্দ আর ধরে না। আসলে আমার মতো আমার বন্ধুরাও দূরে কোথাও বেড়াতে যেতে মজা পায়। অন্যসব বন্ধুদের ভেতর এদের তিনজনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেশি। আমাদের চারজন যেমন চারটি আলাদা দেশ থেকে লন্ডন এসেছি, আমাদের চারজনের ধর্মও আলাদা। শীলা খৃষ্টান, ভিকি হিন্দু, জেন ইহুদি আর আমি মুসলমান। কেউ জানতে চাইলে এসব পরিচয় দেয়া হয় বটে, আমরা কিন্তু কখনও মনে করি না আমাদের দেশ বা ধর্ম আলাদা। নিজেদের দেশকে ভালোবাসলেও আমরা কেউ ধর্ম মানি না।

পরদিন সকালে মা আর দিব্যেন্দু বেরিয়ে যাওয়ার পর আলফ্রেডকে ফোন করলাম। রাতের নেমন্তনের কথা শুনে সে অভিভূত হয়ে গেলো। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলোবাবা মা দুজনে জানে কিনা। জানে শুনে ও খুবই অবাক হলো। বললো, ঠিক সাতটার সময় ও আমাদের বাসায় পৌঁছে যাবে।

পরদিন ছিলো শনিবার। বিবিসির কাজে রোববারের মতো কোনো রুটিন ধরা ছুটি নেই। সপ্তায় একদিন ছুটি পাওয়া যাবে। নিজেদের মধ্যে সবাই ঠিক করে নেয় কে কোন দিন ছুটি নেবে। মার যেমন শনিবারে ছুটি, দিব্যেন্দুর রোববারে। দুজনের একই দিনে হলে ভালো হতো কিন্তু হওয়ার উপায় নেই। তবে কাজের চাপ রোজ সমান থাকে না। কাজ কম থাকলে অফিসে দেরিতে গেলেও চলে কিংবা

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা যায়। আবার যেদিন কাজ বেশি থাকে সেদিন একনাগাড়ে বারো ঘন্টাও কাজ করতে হয়।

সকালে দিব্যেন্দু গাড়ি নিয়ে একা বেরোলো। যাওয়ার সময় মাকে বললো, ছটার মধ্যেই ফিরছি। সালাদটা আমি এসে বানাব।

দিব্যেন্দু চমৎকার সালাদ বানাতে পারে। দেশী আর বিলেতি মিলিয়ে এমন মজার সালাদ বানায়, অনেক সময় আমাদের বাড়ির পার্টিতে মেইন ডিশের চেয়ে সালাদ বেশি খাওয়া হয়ে যায়।

মা বললো, তোর বন্ধুদের কী খাওয়াবি বল। তোমার যা ইচ্ছে করবে। মার পছন্দের উপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিলাম।

আমাদের বাড়িতে ওরা নিশ্চয় বিলেতি খাবার আশা করবে না। মা বললো, মেইন ডিশ-এ ঝাল কম দিয়ে হাড়ছাড়া মুরগির দোপেঁয়াজি করি, একটা চাইনিজ মিক্সড ভেজিটেবল থাকুক প্রন দেয়া, সঙ্গে থাকবে আস্ত স্যামন মাছের রোস্ট। আর কিছু লাগবে?

দারুণ হবে মা! কিন্তু স্যামনের রোস্টটা খুব দামী হয়ে যাচ্ছে না?

মা মিষ্টি হেসে বললো, আলফ্রেড এ বাড়িতে প্রথম আসছে, শীলারা হলে না হয় অন্য কিছু দিতাম। তুই তরকারিগুলো কেটে ফেল। আমি মাছটা নিয়ে আসি।

মুরগি, তরকারি সব আমাদের ফ্রিজেই থাকে। স্যামন মাছ কিংবা গলদা চিংড়ির মতো দামী মাছ কদাচিৎ কেনা হয়। মা চলে যাওয়ার পর ফ্রিজ থেকে আলু, সিম, ফুলকপি, গাজর, বিট সব বের করে খোসা ছাড়ালাম। দু বছর ধরে ছুটির দিনে মাকে আমি রান্নায় সাহায্য করি। দিব্যেন্দু নিজেও খুব ভালো রান্না জানে। তবে ও যখন মাঝে মাঝে এক্সপেরিমেন্ট করে, রান্না আগে যেমন ঘোষণা করে আজ মুরগি রান্না হবে মেক্সিকান আর চাইনিজ রেসিপি মতে, তখন আমি আর মা অদ্ভুত স্বাদের কোনো বস্তু খাওয়ার অপেক্ষায় খুব টেনশনে থাকি।

সন্ধ্যায় দিব্যেন্দু ফেরার আগেই আমাদের রান্নার কাজ শেষ হয়ে গেলো। মা একটা স্ট্রবেরির পুডিংও বানিয়েছে। ডাইনিং টেবিলের চেয়ারগুলো সরিয়ে ফেলেছি বুফে খাওয়া হবে বলে। কালকের গোলাপগুলো এখনও তাজা রয়েছে। টেবিলের কাছে। গেলে গোলাপের মিষ্টি আমেজ ভরা গন্ধ পাওয়া যায়।

দিব্যেন্দু এলো সাড়ে ছটায়। এসেই ঝটপট হোয়াইট সস, সেদ্ধ আলু, মটরশুটি, শসা আর বিট দিয়ে ওর নিজস্ব রেসিপির একটা সালাদ বানালো। গতকাল কেনা রেড ওয়াইন প্রায় পুরো বোতলই রয়ে গেছে। ছোটদের জন্য দিব্যেন্দু মার্টিনি এনেছে।

আলফ্রেডের আসার কথা সাতটায়। শীলা, জেন আর ভিকি সাতটা বাজার দশ মিনিট আগেই এসে পড়েছে। আমি ওদের নিয়ে লিভিংরুমে গিয়ে আড্ডা জমালাম।

ভিকির বাড়ি ইন্ডিয়ার গুজরাটে। বললো, তুই কোত্থেকে যে অদ্ভুত সব বন্ধু জোগাড় করিস দেখলে তোকে হিংসে হয়। একদিনের পরিচয়ে বুড়ো একবারে নিজের বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে বসলো!

আমি শুধরে দিলাম, পুরো একদিনও নয়। কয়েক ঘন্টা বলতে পারিস।

জেন রহস্য করে বললো, বুড়ি হলে না হয় কথা ছিলো। আমাদের নিককে কেন পছন্দ করেছে বোঝা যেতো। সত্তর বছরের এক বুড়োর সঙ্গে মিতালি পাতানো খুব রহস্যজনক মনে হচ্ছে।

আমি হেসে বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত মনে ওর সঙ্গে ডেট করতে পারো, আমরা কিছু মনে করবো না।

জেন গম্ভীর হওয়ার ভান করে বললো, আমার সঙ্গে বুড়ো কোন দুঃখে ডেট করবে–শীলার মতো সুন্দরী মেয়ে থাকতে।

শীলা হেসে বললো, বয়ে গেছে আমার সত্তর বছরের এক বাঁচাল বুড়োর সঙ্গে ডেট করতে।

ভিকি বললো, তুমি কি শুধু বুড়োর বয়সটা দেখবে? ওর ব্যাংক ব্যালেন্সটা দেখবে না?

কথা শুনে সবাই শব্দ করে হেসে উঠলো। সেই হাসির মাঝখানে কখন ডোরবেল বেজেছে, কখন দিব্যেন্দু গিয়ে আলফ্রেডকে ভেতরে এনেছে টেরও পাইনি। চমক ভাঙলো আলফ্রেডের গলার আওয়াজ শুনে–শুভ সন্ধ্যা, ক্ষুদে বন্ধুরা। আমি আসার আগেই পার্টি জমে গেছে দেখছি।

শুভ সন্ধ্যা বলে আমি উঠে গিয়ে ওর সঙ্গে হাত মেলালাম, এসো আলফ্রেড, আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করে দিই।

আলফ্রেডের হাতে মস্ত এক ফুলের তোড়া। সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললো, তোমরা সবাই নিক-এর বন্ধু যখন, আশা করি আমাকেও তোমাদের বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত করবে না।

ভিকি হেসে বললো, এতক্ষণ আমরা তোমার কথা বলছিলাম। আগামীকাল সবাই তোমার বাড়িতে হামলা করার পরিকল্পনা করেছি।

শিশুর মতো সরল হাসিতে আলফ্রেডের মুখ ভরে গেলো–তোমাদের মতো দেবদূতদের দ্বারা আক্রান্ত হলে নিজেকে আমি সৌভাগ্যবান মনে করবো।

আলফ্রেডের কথা শুনে মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমি মাকে পরিচয় করিয়ে দিতে যাবো–আলফ্রেড হাত তুলে বাধা দিলো–আমাকে বলতে হবে না। পরির মতো মিষ্টি মেয়েটি যে আমাদের নিকের মা একথা যে কেউ বলতে পারে।

মা লজ্জায় লাল হয়ে আলফ্রেডের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললো, আমি খুব খুশি হয়েছি তোমাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে।

আমার চেয়ে বেশি খুশি কেউ হয়নি, বলে আলফ্রেড ফুলের তোড়াটা মার হাতে তুলে দিলো।

আলফ্রেডকে ধন্যবাদ জানিয়ে মা বললো, তুমি নিজের বাড়ি মনে করে আরাম করে বসো। আমি এক্ষুনি আসছি।

আলফ্রেড আমাদের বললো, তোমরা সবাই তা হলে কাল এই পাজি বুড়োটার আতিথ্য গ্রহণ করতে ওয়েলস যাচ্ছো।

আনন্দের সঙ্গে সবাই হইহই করে উঠলো। আলফ্রেডের সঙ্গে বসে ঠিক করলাম কখন কীভাবে সবাই একত্রিত হবো। ভিকি বললো, তোমার বাড়িতে যাওয়ার প্রধান আকর্ষণ যদিও তুমি নিজে, দ্বিতীয় আকর্ষণ হচ্ছে তোমাদের পাশের গ্রামের হন্টেড প্যালেস। নিক আমাদের সব বলেছে।

আলফ্রেড হেসে বললো, বাচঁলেকে একবার মাছ ধরতে বসলে তোমরা পৃথিবীর সব কিছু ভুলে যাবে।

শীলা বাচ্চা মেয়ের মতো হাত তালি দিয়ে আদুরে গলায় বললো, ওফ, মাছ ধরার চেয়ে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। আমাদের কি ছিপ নিতে হবে আলফ্রেড?

কোনো দরকার নেই। আমার বাড়িতে প্রচুর আছে।

মা এসে বললো, ডিনার তৈরি। তোমরা যখন খাবে বলবে।

দিব্যেন্দু আমাদের চারজনকে মার্টিনির ককটেল এনে দিলো। আলফ্রেড আর মাকে দিলো ভদকা আর ব্লুবেরির ককটেল। নিজেও নিলো এক গ্লাস।

আমরা সবাই আলফ্রেডের স্বাস্থ্য, আমাদের স্থায়ী বন্ধুত্ব, আগামীকালকের সফল যাত্রার উদ্দেশ্যে পর পর টোস্ট করলাম।

খেতে বসে আলফ্রেড রান্নার প্রশংসা করতে গিয়ে অভিধানের সবচেয়ে সেরা বিশেষণগুলো ব্যবহার করলো। সেসব কথায় মা লজ্জায় আপেলের মতো লাল হয়ে গেলো।

খাওয়ার পর আবার গল্প। ফেরার সময় আলফ্রেড বললো, বহু বছর এত আনন্দভরা পার্টিতে আমি যোগ দিইনি।

আলফ্রেড ছিলো আমাদের পার্টির মধ্যমণি। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর ষোল বছর যে একা দিন কাটাচ্ছে তার কাছে আমাদের বাড়ির সাধারণ পার্টিও যে অসাধারণ মনে হবে এ আর বিচিত্র কী!

.

**৬. আলফ্রেডের জন্য দুঃসংবাদ**

আলফ্রেডের সঙ্গে কথা ছিলো সকাল নটার ভেতর গাড়ি নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসবে। ভিকি একটা ট্যাক্সি নিয়ে শীলা আর জেনকে তুলে আনবে। আলফ্রেডদের বাড়ি ওয়েলস-এর সাউথ গ্ল্যামের্গোনের পেনার্থে। যেতে হবে রাজধানী কার্ডিফ হয়ে। লন্ডন থেকে কার্ডিফ যেতে গাড়িতে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগে। কার্ডিফ থেকে পেনার্থের দূরত্ব বারো মাইল। ঘড়ি ধরে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় নটায় এসে পৌঁছলো আলফ্রেড। তখনও শীলারা এসে পৌঁছায়নি।

দিব্যেন্দু মার সঙ্গে বেরিয়েছে। মাকে বুশ হাউসে নামিয়ে দিয়ে ওর এক বন্ধুর বাড়িতে যাবে কী এক কাজে। যাওয়ার সময় দুঃখ প্রকাশ করেছে থাকতে পারছে না বলে। পরশু রাতের পর দিব্যেন্দু আবার আগের মতো চমৎকার ব্যবহার করছে। ঠিক আগের মতোও নয় তার চেয়ে বরং বেশিই করছে। আমার সঙ্গে সকালে যেমন পরামর্শ করলো, পুরোনো এ বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে আরও ভালো বাড়িতে উঠবে কিনা এ নিয়ে। এ বাড়িতে আমার জন্ম না হলেও চৌদ্দ বছর ধরে থাকার কারণে এটার ওপর এক ধরনের মায়া পড়ে গেছে। দিব্যেন্দুকে সেটা বলাতে ও আর কথা বাড়ায়নি।

আলফ্রেড রাস্তার ওপর গাড়ি থামিয়ে ভেতরে এলো। আমি বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম ওদের অপেক্ষায়। আলফ্রেডকে বললাম, ওরা তো এখনও এলো না। টেলিফোন করে দেখবো?

এত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে! হেসে বললো আলফ্রেড–ওরা না আসা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে একটু এক্সকুসিভ কথা বলবো, যদি বুড়োটাকে অসহ্য মনে না করো।

আলফ্রেড তুমি আমার বন্ধু। গম্ভীর হয়ে বললাম, একথা বলে তুমি আমার বন্ধুত্বকে অপমান করছো। তুমি কী করে ভাবতে পারলে তোমাকে অসহ্য মনে করবো?

আমার কথায় অপ্রস্তুত হয়ে আলফ্রেড বললো, আমি দুঃখিত। তুমি যদি আহত বোধ করো– আমার কথা প্রত্যাহার করছি!

ধন্যবাদ, আশা করি ভবিষ্যতে এরকম কথা তুমি বলবে না।

আলফ্রেড আর আমি ড্রইংরুমে সোফায় বসেছিলাম। আমার কথা শুনে ও বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ আমাকে দেখলো। আমি বিব্রত বোধ করলাম–। এভাবে কী দেখছো আলফ্রেড?

তুমি কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো নিক?

কেন বাসবো না! তোমার মতো চমৎকার বন্ধু কজনের ভাগ্যে জুটে।

আলফ্রেডের চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। আপন মনে বললো, আমি ভাবতেই পারি না, যাকে তার নিজের ছেলেরা পরিত্যাগ করেছে সে কী করে অচেনা কারও এত ভালোবাসা পায়।

আমরা কি এখনও অচেনা আলফ্রেড? তুমি আমাদের পরিবারের হারিয়ে যাওয়া আনন্দ ফিরিয়ে দিয়েছো। তোমাকে আমি এমন অনেক কথা বলেছি যা শীলা পর্যন্ত জানে না।

আলফ্রেড সামান্য হেসে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলো। নিক তুমি এমনভাবে কথা বলো, মনে হয় আমার কাছাকাছি বয়সের কারও সঙ্গে কথা বলছি। তুমি এত জানো, এত বোঝ!

আমি বিব্রত হয়ে শুধু বললাম, ধন্যবাদ আলফ্রেড, আমাকে ভালোবাস বলেই তুমি এতটা গুরুত্ব দিচ্ছো।

ভালো নিশ্চয়ই বাসি। আপনমনে আলফ্রেড বললো, কাল রাতে মনে হয়েছে আমার অপদার্থ দুই ছেলের চেয়েও তুমি আমার বেশি আপন। তোমাকে নিয়ে অনেক কথা ভেবেছি। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে রাতে কথাও বলেছি। আমি ঠিক করেছি।

আলফ্রেডের কথা শেষ না হতেই ডোরবেল বাজলো। ও কী ঠিক করেছে জানা হলো না। উঠে গিয়ে দরজা খুলোম। শীলা, জেন আর ভিকি একসঙ্গে কথা বলতে বলতে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলো। দেরির জন্য ওরা প্রত্যেকে একে অপরকে অভিযুক্ত করছিলো। আলফ্রেডের কাছে ওরা তিনজনই ক্ষমা চাইলো।

আলফ্রেড ব্যস্ত হয়ে বললো, আরে না না। এত বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। আমরা তত বেড়াতেই যাচ্ছি, নিশ্চয় কোনো আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেয়ার জন্য যাচ্ছি না।

তুমি কী ভালো! বলে শীলা আর জেন আলফ্রেডকে জড়িয়ে ধরে ওর দুগালে চুমু খেলো।! ভিকি বললো, আমরা তো ভয়েই বাঁচি না, এক ঘন্টা দেরি না জানি কী বকুনি আছে কপালে।

আলফ্রেড হেসে বললো, আমরা কি এখন যাত্রা শুরু করতে পারি?

ভিকি ষড়যন্ত্রের গলায় বললো, যাওয়ার আগে একটু গলা ভিজিয়ে নিলে হতো না! আমাকে হিন্দিতে বললো, দোস্ত তোর বাবা কাল কী দারুণ মার্টিনি খাওয়ালো! ছিটেফোঁটা আছে নাকি রে! আমিও হিন্দিতে বললাম, কোত্থেকে থাকবে! কাল রাতে অর্ধেক বোতল তুইই তো সাবাড় করলি। ভুলে গেছিস নাকি!

আলফ্রেড রেগে যাওয়ার ভান করলো–এসব কী! আমরা কেউ এখানে ইডিশ ভাষা জানি না। তোমরা দুজন অচেনা ভাষার ষড়যন্ত্র করবে এটা হতে পারে না!

আমি বললাম, ইড্ডিশ নয়, হিন্দি। তোমাকে বলিনি ভিকিরা ইন্ডিয়ান! আমরা কোনো ষড়যন্ত্র করিনি!

একগাল হেসে আলফ্রেড বললো, ঠাট্টা করছিলাম। তুমি কি ভুলে গেছো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পাঁচ বছর আমি ইন্ডিয়াতে ছিলাম?

আমি বললাম, ভিকির গলা শুকিয়ে গেছে। ঘরে অরেঞ্জ জুস আছে, ব্লুবেরি জুসও আছে। কে কোনটা নেবে বলো। আলফ্রেড ছাড়া সবাই একসঙ্গে বললো, ব্লুবেরি। অরেঞ্জ জুসের চেয়ে ব্লুবেরি জুসের দাম বেশি, খেতেও মজা। আলফ্রেড বললো, আমাকে তুমি যা দেবে তাই খাবো।

ঢালতে গিয়ে দেখি ব্লুবেরি জুস তিন গ্লাসের বেশি হচ্ছে না। ওদের ব্লুবেরি দিয়ে আমি আর আলফ্রেড অরেঞ্জ নিলাম। আলফ্রেড একগাল হেসে বললো, আমার আর নিকের ভাগ্য এক সুতোয় বাঁধা।

জেন আদুরে গলায় বললো, আগে বললে না কেন, তা হলে আমিও অরেঞ্জ জুস নিতাম।

আলফ্রেড রহস্য ভরা গলায় বললো, তুমি যদি আমার সঙ্গে তোমার ভাগ্য জুড়তে চাও তা হলে সুতোটা একটু বাড়াতে পারি।

কীভাবে?

আমার গ্লাস থেকে খানিকটা তোমার গ্লাসে ঢেলে দিতে পারি।

আমি হেসে বললাম, ওটা মোটেই উপাদেয় হবে না।

শীলা দার্শনিকের মতো বললো, ভাগ্য কখনও এভাবে বদলানো যায় না। ওটা আগে থেকে ঠিক থাকে।

ভিকি আঁতকে ওঠার ভান করলো, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন! শীলা, এখন থেকেই আমাদের জ্ঞান দেয়া শুরু করলে?

শীলা সুযোগ পেলেই গুরুগম্ভীর সব কথা বলবে, আর ভিকিও ওকে এ নিয়ে খোঁচাবে। আলফ্রেড বললো, জ্ঞানলাভের জন্য কত মানুষ সারাজীবন সাধনা করে শেষ হয়ে যায়। আর তুমি অযাচিতভাবে পেয়েও নিচ্ছো না?

ভিকির মতো দুর্ভাগা মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। শীলা হেসে আলফ্রেডের সঙ্গে গলা মেলালো।

গলা ভেজানোর পর্ব শেষ করে আমরা সবাই আলফ্রেডের মস্ত বড় ফোর্ড গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। গাড়িটা পুরোনো মডেলের, তবে ভেতরটা খুব আরামের। বোঝাই যায় আলফ্রেড ওর গাড়ির যত্ন নেয়।

ও নিজে বসেছিলো ড্রাইভিং সিটে, পাশে আমি। ভিকি, শীলা জেন পেছনে। আমাদের সবার ব্যাগগুলো ওপরের লাগেজ ক্যারিয়ারে।

রোববার লন্ডনে গাড়ির ভিড় কম থাকে বলে শহর থেকে বেরোতে বেশি সময় লাগলো না। হাইওয়েতে ওঠার পর আলফ্রেড গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিলো। শীলা বললো, তুমি কি সব সময় এতটা পথ গাড়িতে যাওয়া আসা করো আলফ্রেড?

না শীলা, গত এক বছর আমি ট্রেনেই যাওয়া আসা করেছি। গাড়ি চালাতে চালাতে আলফ্রেড বললো, এবার আমার অক্সফোর্ডে কিছু কাজ ছিলো, তাই গাড়ি নিয়ে এসেছিলাম।

আমরা কেউ এর আগে ওয়েলস যাইনি। ভিকি জানতে চাইলো–অক্সফোর্ড কি আমাদের পথে পড়বে?

হ্যাঁ বাছা। অক্সফোর্ড, গ্লচেস্টার, নিউপোর্ট হয়ে কার্ডিফ যেতে হয় যদি একটানা গাড়িতে যেতে চাও। সময় বাঁচানোর জন্য অনেকে অবশ্য ব্রিস্টল হয়ে যায়, তবে মাঝখানে ব্রিস্টল চ্যানেল পেরোতে হয় ফেরিতে। সময় কম লাগলেও ঝামেলা বেশি, ভিড়ও বেশি। আমার তো অতো তাড়া নেই। তাই গাড়িতে এলে এ পথটাই ব্যবহার করি।

ভিকি গলা বাড়িয়ে বললো, আলফ্রেড, তুমি হিন্দি জানো?

আলফ্রেড হেসে বললো, কেন, নিকের সঙ্গে আমাকে নিয়ে হিন্দিতে মজা করতে অসুবিধে হচ্ছে!

আহ্ আলফ্রেড, আমার কথার জবাব দাও।

বলতে পারি না। কিছু শব্দ বুঝি।

ঠিক আছে, তোমাকে আমি হিন্দি শেখাবো। নিজের লোকদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা না বললে আমি ঠিক জমাতে পারি না।

শীলা বললো, জেনকে শেখাতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়ে এখন বুঝি আলফ্রেডকে ধরতে চাইছো?

আলফ্রেড বললো, কেন, জেন কি ছাত্রী হিসেবে ভালো নয়?

জেন হৈচৈ করে উঠলো–কী বলছো তুমি! আমি গত পরীক্ষায় ছটা এ পেয়েছি।

ভিকি তবে হাল ছেড়ে দিলো কেন?

জেন হেসে বললো, যখন জানলাম ভিকি একটা জার্মান আর একটা টার্কিস মেয়েকে হিন্দি শেখানো শুরু করেছে তখনই বলেছি আমার দ্বারা হিন্দি শেখা হবে না।

আলফ্রেড মুখ টিপে হেসে বললো, তুমি কি কখনও ভিকিকে বলেছিলে তোমাকে ছাড়া আর কোনো মেয়েকে ও হিন্দি শেখাতে পারবে না?

বলতে হবে কেন? জেন রেগে যাওয়ার ভান করলোও কি সেটা বুঝতে পারে না?

শীলা হেসে বললো, সাধেই কি আমি বলি, ভিকির মতো দুর্ভাগা মানুষ পৃথিবীতে যে খুব কম আছে!

ভিকি কোণঠাসা হয়ে বললো, লন্ডনে ফিরে এসে আমি মেয়েদের জন্য হিন্দি শেখার ক্লাস খুলবো।

জেন ফোড়ন কাটলো–ওখানে কেবল মার্থাদের মতো ধুমসি মেয়েরাই ভর্তি হবে।

শীলা, ভিকি, জেনের কথা শুনতে শুনতে আলফ্রেড মিটিমিটি হাসছিলো। ওরা নিজেদের ভেতর খুনসুটি শুরু করেছে। আমি মৃদু গলায় বললাম, তুমি বিরক্ত হচ্ছে না তো আলফ্রেড?

আলফ্রেড ফিসফিস করে বললো, আমার জন্য তুমি স্বর্গের আনন্দ বয়ে এনেছে।

আমি কোনো কথা বললাম না। ভাবলাম, কত অল্পে মানুষ সন্তুষ্ট হয়। আলফ্রেডের জন্য আমার বুকের ভেতর একটা নরম কোণ তৈরি হয়ে গেলো। মনে মনে বললাম, তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ।

ঠিক একটার সময় লিডনি নামের ছোট নিরিবিলি এক লোকালয়ে গাড়ি থামালো আলফ্রেড। একপাশে নদী, আরেক পাশে গভীর বন। হাইওয়ের পাশে এই লোকালয়টি মনে হয় গড়ে উঠেছে দূরের যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য। আলফ্রেড গাড়ি থামিয়েছিলো একটা রেস্তোরাঁর সামনে। পাশেই পেট্রল পাম্প, অল্প দূরে ছোট্ট একটা গির্জা, গোটা চারেক মুদির দোকান, আর কিছু ঘরবাড়ি। বেশির ভাগ বাড়িই কাঠের। এমনকি লিডনি রেস্টুরেন্টও। কাঠের সুইংডোর ঠেলে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। রেস্তোরাঁর মেঝেও কাঠের। ভেতরের কোণে দুই বুড়োবুড়ি ছোট্ট টেবিলের ধারে বসে আছে মুখোমুখি। কাউন্টারে মোটাসোটা এক লোক বসে ঝিমোচ্ছিলো। আমাদের পায়ের আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এলো। বিগলিত গলায় আলফ্রেডকে বললো, আমি ম্যানেজার। আপনারা লাঞ্চ করবেন তো? এখানটায় বসুন।

আমরা একটা বড় গোলটেবিলের চারপাশে বসলাম। ম্যানেজার বললো, আপনাদের কী দেবো বলুন।

আলফ্রেড বললো, আগে গলা ভেজাবার জন্য কিছু দাও। কী আছে তোমাদের?

একগাল হেসে ম্যানেজার বললো, সব পাবেন। পনেরো বছরের পুরোনো স্কচ হুইস্কি যদি চান তাও পাবেন। বিয়ার নিতে পারেন কিংবা যদি বলেন কোনো ককটেল–

ততক্ষণে শীলা আর জেন হেসে গড়িয়ে পড়েছে। স্কচ হুইস্কি দিয়ে ওদের গলা ভেজাতে হবে–এর চেয়ে হাসির কথা আর কী হতে পারে! ওদের হাসি দেখে আলফ্রেড ব্যস্ত হয়ে ম্যানেজারকে থামালো–ওসব চলবে না। এদের বাপ মা জানতে পারলে আমাকে আস্ত রাখবে না। তুমি বরং লেমোনেড দাও।

ভিকি আদুরে গলায় বললো, একটু মার্টিনি হলে মন্দ হতো না।

আলফ্রেড মুখ টিপে হাসলো, ঠিক আছে, লেমোনেডের সঙ্গে মার্টিনি মিশিয়ে দাও।

মার্টিনিতে সামান্য অ্যালকোহল থাকলেও এটাকে কেউ হার্ড ড্রিংকস বলে না। পার্টিতে আমাদের মার্টিনি খেতে কেউ কখনও আপত্তি করেনি। ম্যানেজার পাঁচটা গ্লাসে টলটলে লাল মার্টিনি এনে টেবিলে রাখলো–এবার বলুন খাবার কী দেবো?

কী আছে তোমাদের? জানতে চাইলো আলফ্রেড।

খিদে বেশি পেলে ল্যাম্ব স্টেক নিতে পারেন। আলু মটরশুঁটি ভাজি আছে। চিকেন। স্টু আছে।

আলফ্রেড আমাদের জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কী নেবে বলো!

শীলা বললো, ল্যাম্ব স্টেক।

ভিকি, জেন আর আমিও স্টেক চাইলাম। আলফ্রেড নিলো চিকেন স্টু। বললো, বয়স হয়েছে। ল্যাম্ব স্টেক-এ প্রচুর চর্বি থাকে, আমার জন্য চিকেন ভালো। আলফ্রেড স্টেকের সঙ্গে আলু মটরশুটি ভাজাও দিতে বললো। ম্যানেজার বললো, দশ মিনিটের ভেতর সার্ভ করছি।

চারদিকে কোনো শব্দ নেই। বাইরে শীতের বিষণ্ন দুপুর। বনের ভেতর ন্যাড়া গাছগুলো বসন্তের অপেক্ষায় ধুকছে। ভেতরে কোণের টেবিলে দুই খুনখুনে বুড়োবুড়ি নিচু গলায় নিজেদের ভেতর কথা বলছে। শীলা বললো, ভারি সুন্দর জায়গা।

ভিকি বললো, ওয়েস্টার্ন ছবিতে এরকম কাঠের কেবিনে বসে সবাই মগভর্তি বিয়ার খায়।

জেন ওকে ফোড়ন কাটলো–ওই শুরু হলো।

ভিকি গম্ভীর হয়ে বললো, ড্রিংসের মজা মেয়েরা কি বুঝবে!

শীলা মৃদু হেসে বললো, তোমার এখনও মজা বোঝার বয়স হয়নি ভিকি!

আমি খেতে চাইনি। শুধু একটা বর্ণনা দিচ্ছিলাম।

জেন বললো, যার মনে যা সে তাই তো বলবে শীলা! ওয়েস্টান ছবিতে শুধু কি বিয়ার খায়! এরকম কেবিনে বসে কড়া কফিও খায়।

আলফ্রেড হাসিমুখে ওদের কথা শুনছিলো। বললো, তোমাদের সঙ্গে কিছুদিন কাটালে আমার বয়স অর্ধেক হয়ে যাবে।

ম্যানেজার টেবিলে খাবার দিয়ে গেলো। তখনই চুলো থেকে নামিয়ে এনেছে। স্লাইস করা পাউরুটি, মাখন, স্টেক আর আলু মটর ভাজি দিয়ে লাঞ্চ সারতে দারুণ লাগলো। খাওয়ার পর শীলা বললো, আলফ্রেড, তুমি যদি কিছু মনে না করো একটা কথা বলতে চাই।

একটা কেন, হাজারটা কথা বলো। ব্যস্ত গলায় বললো আলফ্রেড।

আমরা তো এখনও তোমার বাড়িতে যাইনি। লাঞ্চের বিলটা আমরা নিজেরা দিতে চাই।

আহত গলায় আলফ্রেড বললো, আমাকে এভাবে অপমান কোরো না শীলা। যখন থেকে আমার সঙ্গে বেরিয়েছে তখন থেকে তোমরা আমার অতিথি। ওয়েলস-এর লোকেরা এ ধরনের কথা বা আচরণকে অপমান মনে করে।

দুঃখিত আলফ্রেড। শীলা বিব্রত গলায় বললো, আমি মোটেই তোমাকে অপমান করতে চাইনি। তখন থেকে তোমাকে ট্যাক্স করছি দেখে খারাপ লাগছিলো।

আমাকে বন্ধু ভাবলে খারাপ লাগতো না। ট্যাক্সের কথা কী বলছো? আমার যা সঞ্চয় তোমরা খেয়ে কোনো দিন শেষ করতে পারবে না। আলফ্রেডের চেহারা থমথম করছিলো।

পরিবেশটা হালকা করার জন্য হাতজোড় করে ভিকি বললো, এ যাত্রা মাপ করে দাও আলফ্রেড, এমন অন্যায় কথা জীবনেও আমাদের মুখ দিয়ে বেরোবে না।

মনে থাকে যেন! আলফ্রেডের মুখে হাসি ফুটলো।

লিডনি থেকে লাঞ্চ সেরে গাড়িতে উঠতে উঠতে তিনটা বেজে গেলো। শীতের দুপুরগুলো অদ্ভুত এক আলস্যে ভরা থাকে। আমরা সব কিছুই করছিলাম ঢিলেঢালাভাবে। লাঞ্চ সেরে কফি খেতে আধঘন্টা লাগিয়ে দিলাম।

ওয়েলস-এর রাজধানী কার্ডিফে যখন পৌঁছলাম তখন সূর্য পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেছে। গাড়ির কাঁচ বন্ধ থাকাতে বাইরে কী রকম কনকনে ঠান্ডা বাতাস টের পাচ্ছিলাম না।

সন্ধ্যার পর যখন পেনার্থ-এ আলফ্রেডের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেকে নামলাম–পাহাড়ি নেকড়ের মতো ঠান্ডা বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের ওপর। চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম আলফ্রেড একচুলও বাড়িয়ে বলেনি।

সূর্য ডুবে গেলেও আকাশে তখন গোধূলির লাল রঙ ছড়িয়ে ছিলো। বিশাল জায়গা জুড়ে বার্চ আর লাইম গাছের বন। বনের মাঝখানে খোলা জায়গায় আলফ্রেডের ছবির মতো কাঠের দোতলা বাড়ি। পশ্চিমে বার্চ লেক, আরও পশ্চিমে গিয়ে মিশেছে কালো পাহাড়ের গায়ে। পথে যে কয়টা বাড়ি চোখে

পড়েছে সবই বিরাট জায়গার ওপর। আলফ্রেডকে বললাম, তুমি বলেছিলে সুন্দর । এতটা সুন্দর বাড়ি আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

জেন উচ্ছ্বসিত গলায় বললো, এত সুন্দর বাড়ি আর পরিবেশ ফেলে তুমি নোরা লন্ডনে কেন পড়ে থাকো আমার মাথায় ঢুকছে না।

আলফ্রেড হাসিমুখে বললো, ঢোকার যথেষ্ট সময় আছে। এখন বাড়ির ভেতরে চলো। বাইরে বেশিক্ষণ থাকলে শীতে জমে যাবে।

সবাই দৌড়ে বাড়ির বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। আলফ্রেড তালা খুললো। ঘরে ঢুকে অনেকগুলো সুইচ টিপলো। সারা বাড়ি আলোয় ভেসে গেলো।

আমরা আলফ্রেডের বিরাট ড্রইংরুমে এসে বসলাম। আসবাবপত্র পুরোনো হলেও আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে সবখানে। দেয়ালে দুটো বড় অয়েলপেইন্টিং, একপাশে রিডিং কর্নার। সেখানে অনেকগুলো ফ্রেমে বাঁধানো পারিবারিক ছবি ঝোলানো রয়েছে। আলফ্রেড বললো, আমার একটা কেয়ার টেকার আছে হার্ভে নাম। ওকে ফোন করে দিই। রাতে হয়তো আসতে পারবে না, কাল সকালে আসবে। ভিকি আর নিক কি দয়া করে গাড়ির ওপর থেকে ব্যাগগুলো নামিয়ে আনবে? আজ রাতের জন্য কিচেনের দায়িত্ব শীলা আর জেনের।

শীলাদের অবশ্য কিচেনে তেমন কিছু করার ছিলো না। আলফ্রেড আসার পথে কার্ডিফের এক ডিপার্টমেন্ট শপ থেকে প্রচুর খাবার কিনেছে। বেশ কিছু কুড ফুডও ছিলো যা একটু গরম করে নিলেই হলো।

আলফ্রেড টেলিফোন করতে দোতলায় গেলো। আমরা আমাদের লাগেজগুলো এনে ড্রইংরুমে রাখলাম। শীলা খাবারের প্যাকেটগুলো রান্নাঘরে নিয়ে গেলো। বললো, এই শীতে কফি খেতে মন্দ লাগবে না।

কিছুক্ষণ পর দোতলা থেকে চিন্তিত মুখে নেমে এলো আলফ্রেড। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, সব কিছু ঠিক আছে তো আলফ্রেড?

শীলা জেন দুটো ট্রেতে করে কফি আর কিছু ক্র্যাকার্স নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরোলো। আলফ্রেড ওদের দিকে একবার তাকালো। তারপর বিব্রত গলায় বললো, বুঝতে পারছি না কিছু। কার্ডিগান থেকে আমার বড় বোন জরুরী টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে। খবর পাওয়া মাত্র যেন ওর সঙ্গে দেখা করি। হার্ভে বললো, কয়েকবার নাকি টেলিফোনও করেছে। বলেছে ওর নাকি খুব বিপদ!

আমি বুঝলাম নেমন্তন্ন করে এনে আলফ্রেড আমাদের একা ফেলে যেতে চাইছে। । অথচ ওর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে যাওয়াটা খুব জরুরী। বললাম, আলফ্রেড তুমি কাল সকালেই রওনা হয়ে যাও। বোনের বিপদের সময় তোমার পাশে থাকা উচিত।

আলফ্রেড বললো, তাই বলে তোমাদের একা ফেলে যাবো?

আমরা যথেষ্ট বড় হয়েছি। আমি বললাম, আমাদের জন্য তুমি বিন্দুমাত্র ভেবো না।

### ৭. অতৃপ্ত আত্মা না ভিন গ্রহের আগন্তুক

বাইরে থেকে আনা তৈরি খাবার দিয়ে ডিনার সারতে সারতে নটা বেজে গেলো। খাওয়ার পর আমরা সবাই ড্রইংরুমে বসেছিলাম। বাইরে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের একেবারে কাছে নেমে এসেছে। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ থাকলেও ভেতরে একটা ঠান্ডা ভাব রয়েছে। ফায়ার প্লেসের আগুন এত বড় ঘর গরম হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো না। আলফ্রেড একটা রকিং চেয়ার নিয়ে ফায়ার প্লেসের একেবারে কাছে বসেছিলো। ওর বোনের কথা বলছিলো আমাদের।

শার্লি আমার তিন বছরের বড়, গত নবেম্বরে পঁচাত্তরে পা দিয়েছে। আলফ্রেড পাইপের ধোয়া ছেড়ে বললো, নবেম্বরের তিরিশ তারিখে ওর জন্মদিনে টেলিফোনে ওকে উইশ করেছিলাম। তখন ও বলেছিলো–আজকাল ওর কেমন যেন ভয় ভয় লাগে। রাতে কারা নাকি বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। চোখে দেখা যায় না তবে টের পাওয়া যায়। শার্লি ছোটবেলা থেকেই একটু ভয়কাতুরে। ওকে বলেছিলাম, ভয়ের গল্প পড়া আর ভয়ের ছবি দেখা বন্ধ করতে । ও বললো, চিরকাল ভয়ের গল্প পড়ে কাটালাম–কিছু হলো না, এখন কেন হবে! ওকে বললাম, তোমার বয়স হয়েছে রাতে নিশ্চয় ভালো ঘুম হয় না। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করো। তারপর ওর সঙ্গে আর কথা হয়নি। আমি অবশ্য গত তিন সপ্তাহ ধরে লন্ডনে। এর মধ্যে বেচারা দুবার ফোন করেছিলো।

এখানে আসার পর আলফ্রেড ওর বোনকে ফোন করার চেষ্টা করেছিলো। লাইন না পেয়ে এক্সচেঞ্জে ফোন করেছে। ওখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বলেছে, লাইন নাকি খারাপ।

শীলা বললো, তোমার বোন একা থাকে কেন? তোমরা দুজন একসঙ্গে থাকলেই তো পারো।

ও বরাবরই স্বাধীনচেতা। আলফ্রেড বললো, পাঁচ বছর হলো ওর স্বামী মারা গেছে। একটামাত্র মেয়ে, কানাডায় থাকে, চার পাঁচ বছরে একবার আসে। তারও ওখানে বড় সংসার। নিয়মিত মার খবর নিতে পারে না। আমি বহুবার বলেছি এখানে এসে থাকতে। শার্লি রাজি হয়নি।

খাওয়ার সময় আলফ্রেডের সঙ্গে আমাদের কথা পাকা হয়ে গেছে। ও কাল সকালে কার্ডিগান যাচ্ছে। এখান থেকে মাত্র দুঘন্টার ড্রাইভ। ওর বোনের খবর নিয়ে দিনে দিনে ফিরে আসবে। নয়তো একরাত ওখানে থাকবে। আমাদের দেখাশোনা করবে। হার্ভে। ইচ্ছে করলে আমরা বার্চ লেকে মাছ ধরতে পারি। কিংবা নৌকা নিয়ে ঘুরতেও পারি। আলফ্রেডের নিজের নৌকা রয়েছে।

সাড়ে নটার দিকে হার্ভে এলো। বয়স পঞ্চাশের ওপর হলেও বেশ শক্ত সমর্থ পরিশ্রমী শরীর। চেহারাটা একটু রুক্ষ প্রতিকৃতির । আলফ্রেড আমাদের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলো। ও শুধু–হ্যালো এভরিবডি বললো।

আলফ্রেড ওকে বললো, শার্লির কী হয়েছে কিছু আর্চ করতে পেরেছো?

না স্যার! কথা শুনে মনে হয়েছে ভীষণ ভয় পেয়েছেন। আমি বলেছিলাম কী দরকার আমাকে জানাতে। তিনি বার বার বললেন, তোমাকে দিয়ে হবে না। আলফ্রেডকে দরকার। আমি তারপরও বলেছিলাম, যদি তেমন কোনো বিপদ হয় পুলিশকে বলুন। তিনি আরও বেশি ঘাবড়ে গেছেন। বললে, এটা পুলিশের কাজ নয়, আমার দরকার ওঝা।

আলফ্রেডও বিরক্ত হয়ে বললেন, সারাক্ষণ ওর মাথায় কেবল ওসবই ঘোরে! হার্ভে, তুমি আমাদের তরুণ অতিথিদের জন্য নিচের তলায় গেস্টরুম দুটো রেডি করে দাও।

হার্ভে আমাদের ব্যাগ নিয়ে চলে গেলো। ড্রইংরুমের পাশেই গেস্টরুম। দশ মিনিট পর হার্ভে এসে বললো, রুম রেডি। একটা ছেলেদের জন্য, একটা মেয়েদের জন্য।

ঠিক তখনই ওপরে টেলিফোনের রিং হলো। হার্ভে টেলিফোন ধরতে গেলো। আলফ্রেড একটু অবাক হয়ে বললো, এখানে আবার কে ফোন করতে এলো?

একটু পরেই হার্ভে ওপর থেকে ডাকলো–মিস্টার আলফ্রেড স্যার, আপনার বোন ফোন করেছেন। দয়া করে জলদি আসুন।

আলফ্রেড শোনামাত্র দৌড়ে গেলো। অন্য সময় হলে বাহাত্তর বছরের একজন বুড়োকে এভাবে দৌড়াতে দেখলে ভিকি আর জেন হেসে খুন হতো অথচ আজ ওর বোনের বিপদের কথা ভেবে ওরা সবাই গম্ভীর হয়ে বসে ছিলো। মনে হচ্ছিলো কার্ডিগানের অচেনা বুড়ি বুঝি ওদের খুব কাছের একজন। আমি একবার ভেবেছিলাম আলফ্রেডকে বলবো–তোমার বোনের বিপদ আর আমরা এখানে ফুর্তি করবো এটা হয় না। চলো আমরাও তোমার সঙ্গে যাই। পরে মনে হলো এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আলফ্রেডের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব থাকলেও ওর বোন আমাদের সহজভাবে নাও নিতে পারে।

একটু পরে আলফ্রেড ওপর থেকে আমাদের ডাকলো–নিক, তোমার বন্ধুদের নিয়ে ওপরে আসবে?

আসছি, বলে আমরা চারজন আলফ্রেডের চেয়েও বেশি দ্রুত দোতলায় ছুটে গেলাম।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার পর এক চিলতে বারান্দা সামনে পড়লো। টেলিফোনটা বারান্দার এক কোণে রাখা। আলফ্রেড ফোনে বলছিলো। –হ্যাঁ শার্লি ওরা এসে গেছে। আমি কথা বলছি, তুমি লাইনে থাকো। এই বলে রিসিভারটা মুখ থেকে সরিয়ে ও আমাদের বললো, একটু আগে শার্লির টেলিফোন ঠিক হয়েছে। সত্যিই খুব ভয় পেয়েছে। তোমাদের কথা শুনে ও বলছে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যেতে । নাকি ওর বাড়ি ভরা লোক থাকলে ওরা কিছু করতে সাহস পাবে না।

আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম–ওরা কারা?

সেটাই তো শার্লি ফোনে বলছে না। বার বার বলছে পারলে চলে এস। ওকে কী বলবো?

শীলা শান্ত গলায় বললো, বলো কাল সকালে তোমার সঙ্গে আমরাও কার্ডিগান যাবো।

ধন্যবাদ শীলা। শীলার কথা শুনে স্বস্তি বোধ করলো আলফ্রেড-তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ, বলে ও রিসিভার মুখের কাছে নিয়ে বললো, ঠিক আছে শার্লি, ওরাও আমার সঙ্গে আসবে। তুমি ঘুমের ঔষধ খেয়ে শুয়ে পড়ো। তোমার কাজের মেয়েটাকে বলো, দরজা জানালা সব ভেতর থেকে বন্ধ করতে।

ওপাশ থেকে শার্লি বোধহয় আমাদের ধন্যবাদ জানিয়েছে। আলফ্রেড বললো, তোমার ধন্যবাদ ওদের পৌঁছে দেবো। তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ো।

টেলিফোন রেখে আলফ্রেড আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো, শার্লি তোমাদের ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। একটু থেমে বললো, তোমরা তা হলে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। কাল খুব সকালে রওনা দিতে চাই।

আলফ্রেডকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমরা নিচে আমাদের ঘরে এলাম। শীলা আর জেনকে নিয়ে আমাদের ঘরে বসলাম। প্রত্যেক ঘরে পাশাপাশি দুটো বিছানা ওয়ার্ডরোব ড্রেসিং টেবিল পরিপাটি করে সাজানো। দুটো ঘরের সঙ্গেই অ্যাটাচড বাথরুম রয়েছে। হার্ভে আমাদের শুভরাত্রি বলে বাইরের ঘরে শুতে গেছে।

জেন বললো, আলফ্রেডের বোনের যদিও বিপদ, আমার কাছে পুরো ব্যাপাটা খুব উত্তেজনাকর মনে হচ্ছে।

শীলা বললো, এতে উত্তেজিত হওয়ার কী আছে?

বারে, শোননি শার্লি কী বলেছে। ওর ওঝা দরকার। চোখে দেখা যায় না অথচ উপস্থিতি টের পাওয়া যায়–এটাকে তোমরা রোমাঞ্চকর বলবে না?

ভিকি বললো, শার্লির বাড়িতে খারাপ কোনো ভূতের পাল্লায় একবার পড়ে দেখো, রোমাঞ্চ কীভাবে উধাও হয় টেরও পাবে না।

জেন বললো, কদিন আগে একটা সাইফি ছবিতে দেখেছি, এরকম এক নিঃসঙ্গ বুড়ির বাড়িতে আউটার স্পেস থেকে এক ধরনের বুদ্ধিমান প্রাণী এসেছিলো।

আমার মতো শীলা জেন আর ভিকিও সায়েন্স ফিকশন আর হরর পছন্দ করে। এ নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা হলো, ভূত না ভিন গ্রহের আগন্তুক। শীলা বললো, ওসব কিছুই নয়। নিশ্চয় কোনো খারাপ লোক ভয় দেখাচ্ছে।

শীলার কথা জেনের পছন্দ হলো না। হাই তুলে বললো, আমার ঘুম পাচ্ছে।

আমরা তা হলে শুতে যাই নিক। এই বলে শীলা জেনকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

ভিকি বললো, তোর ঘুম পাচ্ছে না ইয়ার?

বিছানায় শুলে অবশ্য ঘুম আসবে। তুই কী করবি?

আমি এখন একটা লম্বা ঘুম দেবো।

ঠিক আছে, শুয়ে পড়। লাইট নিভিয়ে দিচ্ছি। সুইচ টিপে টেবিল লাইটটা নিভিয়ে দিলাম। সারা ঘর অন্ধকারে ডুবে গেলো। আমি বিছানায় শুয়ে মা আর দিব্যেন্দুর কথা ভাবলাম। আলফ্রেড ঠিকই বলেছে। আমার একটা আলাদা জগৎ তৈরি হচ্ছে যেখানে ওদের প্রয়োজন নেই। ওরা কি ভাবতে পারবে ওয়েলস-এর গ্রামে কীভাবে রাত কাটাচ্ছি, কিংবা আগামীকাল আমাদের কীভাবে কাটবে? প্রত্যেক মানুষেরই একটা আলাদা জগৎ থাকে।

ভোরবেলা হার্ভের ডাকে ঘুম ভাঙলো। তখনও বাইরে ভালোমতো আলো ফোটেনি। চারদিক ঘন কুয়াশা ঢাকা। একহাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। হার্ভে বললো, তৈরি হয়ে নাও, আমার ব্রেকফাস্ট রেডি।

আলফ্রেড উঠেছে?

ডাইনিং টেবিলে অপেক্ষা করছেন তোমাদের জন্য।

আমরা এক্ষুণি আসছি, বলে ভিকিকে ঘুম থেকে তুলে আমি বাথরুমে ঢুকলাম।

পনেরো মিনিট পরে আমি আর ভিকি মুখ হাত ধুয়ে ডাইনিং রুমে এসে দেখি শীলা আর জেনও এসে গেছে। ওরা একেবারে পোশাক পরে তৈরি হয়েই এসেছে। ভিকির চোখে তখনও ঘুম লেগে আছে।

জেন বললো, ছেলেদের নিয়ে এই এক জ্বালা। কোনো কাজই সময়মতো করতে পারে না।

আলফ্রেড বললো, আমি কি ছেলেদের দলে নই?

জেন বললো, বোনের বাড়িতে যাওয়ার তাড়া না থাকলে তুমিও ঘুম থেকে উঠতে নটা বাজাতে।

আমি এক সময় সামরিক বাহিনীতে ছিলাম জেন ডার্লিং। ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে দেরি হতে পারে, আমার কখনও দেরি হয় না।

বেশি ভোরে আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। এক টুকরো রুটি, আধসেদ্ধ ডিম আর চা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারলাম। ভিকি ঘুমের ঘোরে চায়ে চিনির বদলে লবণ ঢেলে সবার হাসির কারণ হলো। বেচারা একটু বেশি ঘুমকাতুরে।

আলফ্রেডের বাড়ি থেকে আমরা ঠিক আটটায় বেরোলাম। তখনও যথেষ্ট কুয়াশা ছিলো। আলফ্রেড হেডলাইট জ্বালিয়ে কম স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিলো, ঘন ঘন হর্ণ দিচ্ছিলো। দুর্ঘটনা কখন ঘটে কিছুই বলা যায় না।

দশটায় যখন আমরা উঁচু পাহাড়ি জনপদ কার্ডিগানে আলফ্রেডের বোনের বাড়িতে পৌঁছলাম তখন কুয়াশা কেটে রোদ উঠলেও ওতে এতটুকু তেজ ছিলো না। তবে বেশ বাতাস ছিলো। কার্ডিগান জায়গাটা একেবারে সমুদ্রের ধারে। ছোট বড় নানা আকারের পাহাড়ের ওপরে ঘরবাড়ি ছড়িয়ে রয়েছে। সমুদ্রের ধারে জেটিতে কতগুলো নৌকা বাঁধা। দূরে জেলেদের লম্বা জাল শুকোতে দেয়া হয়েছে। সমুদ্র থেকে উঠে আসা ঠান্ডা বাতাস আমাদের শরীরের যতটুকু জায়গা খোলা পেলো সেখানেই হুল ফোঁটালো।

শার্লির বাড়িটা কাঠের। আলফ্রেডের বাড়ির মতো বড় না হলেও ওপরে নিচে সব মিলিয়ে ছয় সাতটা ঘর। পেইন্ট করেছে বেশি দিন হয়নি। দূর থেকে পাহাড়ের ওপর ধূসর আকাশের পটভূমিতে ধবধবে সাদা বাড়িটাকে মনে হচ্ছিলো একটা বড় সৃগাল বসে আছে।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই আলুথালু পোশাকে ছুটে এলো শার্লি। মনে হয় আলফ্রেডের চেয়ে কম করে হলেও দশ বারো বছরের বড় হবে। আলফ্রেড গাড়ি থেকে নামতেই ওকে জড়িয়ে ধরে ফোৎ ফোৎ করে কাঁদলো–আমি তো ভেবেছিলাম মরণের আগে তোর আর দেখা পাবো না। কী ভয়ঙ্কর বিপদ যাচ্ছে আমার ওপর–কথা শেষ করার আগেই আমাদের ওপর শার্লির চোখ পড়লো–এরা বুঝি

তোর সেই গেস্ট। আলফ্রেডকে ছেড়ে শার্লি আমাদের কাছে এসে সবার কপালে চুমু খেলো ভারি খুশি হয়েছি তোমরা এ বুড়ির অনুরোধে সাড়া দিয়েছো দেখে। কাল রাতে আলফ্রেডের সঙ্গে কথা বলার পরও ভেবেছি–বললাম তো তোমাদের আসতে, সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে তো?

শীলা বললো, ওরা কি কাল রাতেও এসেছিলো?

শার্লি এক ধাপ গলা নামিয়ে বললো, আস্তে বলো, দেয়ালেরও কান আছে। কাল রাতেও এসেছিলো ওরা।

আলফ্রেড এগিয়ে এসে একটু বিরক্ত হয়ে বললো, তখন থেকে তুমি হেঁয়ালি করছো শার্লি। ওরা কারা তা বলবে তো?

সব বলবো! শুকনো গলায় শার্লি বললো, তার আগে ঘরে চলো। কখন কার। নজরে পড়ি কিছুই ঠিক নেই।

যে যার ব্যাগ নিয়ে আমরা শার্লির পেছন পেছন ওর ড্রইংরুমে গিয়ে বসলাম। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। পাশে একটা ইজিচেয়ারের মতো, একখানা টকটকে লাল কম্বল পড়ে আছে ওটার ওপর। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম বাড়ির বাইরের দিকটা সাদা হলেও ভেতরে সবখানে উজ্জ্বল রঙের ছড়াছড়ি। সোফায় রং সোনালি হলুদ, কার্পেটের রঙ লাল, জানালার পর্দায় লাল নীল আর হলুদের ছোপ দেয়া। এমনকি শার্লির পরনের গাউনটা ছিলো উজ্জল সব রঙের ছাপওয়ালা।

আমি তোমাদের জন্য ব্রেকফাস্ট তৈরি করে রেখেছি। শার্লি বললো, চলো টেবিলে গিয়ে সবাই বসবে।

আলফ্রেড বললো, আমরা খেয়েই বেরিয়েছি।

তাতে কী! এখানকার পাহাড়ি বাতাসে কদিন ঘুরলে টের পাবে! এখানে ঘণ্টায় ঘন্টায় মানুষের খিদে লাগে।

সকালে আমার আর ভিকির খাওয়া ঠিকমতো হয়নি। আমরা কথা না বাড়িয়ে খেতে বসে গেলাম।

জেন বললো, ছেলেদের খাওয়া দেখলে আমার বিশেষ একটা প্রাণীর কথা মনে হয়।

কী প্রাণী? জানতে চাইলে ভিকি।

শীলা বললো, আহ জেনি। ওরা খেতে বসেছে, এখন আজেবাজে কথা বোলো না।

আমি বললাম, তোমরা কিছু খেলে পারতে!

জেন বললো, আমরা হিসেব করে খাই।

ভিকি বললো, দেখলাম তো সকালে হাঁসের মতো প্লেটের পর প্লেট ওড়ালে। পেটে জায়গা থাকতে হবে তো!

জেন হেসে বললো, শুয়োরের চেয়ে হাঁস অনেক ভালো।

শুয়োর কে?

যারা ঘোৎ ঘোঁৎ করে। সারাক্ষণ ওই প্রাণীটার মতো খেতে আর দাপাদাপি করতে ভালোবাসে।

আলফ্রেড মৃদু হেসে ওর বোনকে বললো, সব সময় দেখবে ওরা চড়ুই পাখির মতো কিচিরমিচির করছে।

শার্লি বললো, আমার ভারি আনন্দ লাগছে আলফ্রেড। কতদিন পর ছোট ছেলেমেয়েদের গলার শব্দ শুনলাম।

খাওয়ার পর ভেবেছিলাম বাইরে বেরিয়ে চারপাশটা একটু ঘুরে দেখবো। শার্লি হয়তো আমাদের সামনে আলফ্রেডকে ওর বাড়ির সমস্যার কথা বলতে সংকোচ বোধ করছে। মেয়েদের অনেক ব্যক্তিগত সমস্যা যা সবাইকে বলা যায় না। আলফ্রেডকে বললামও–আমরা কি কিছুক্ষণের জন্য ঘুরে আসতে পারি?

আলফ্রেড কিছু বলার আগে শার্লি ব্যস্ত গলায় বললো, তোমরা আবহাওয়ার বুলেটিন শোননি? আজ যে কোনো সময়ে বৃষ্টি নামতে পারে। এই ঠান্ডায় বৃষ্টিতে ভিজলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া হবে।

বাইরে তাকিয়ে দেখলাম শার্লি বা আবহাওয়ার বুলেটিন মিথ্যে বলেনি। কিছুক্ষণ আগেও বাইরে রোদ ছিলো, আকাশে তেমন মেঘ ছিলো না। অথচ এরই মধ্যে সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে। এলোমেলো ঠান্ডা বাতাস বইছে। আলফ্রেড বললো, তোমরা এখন কোথাও যেয়ো না নিক! আকাশের অবস্থা ভালো নয়। ঝড় আসবে। এই বলে নিজের বোনের দিকে তাকালো–শোনো শার্লি, ছেলেমেয়েগুলোকে লন্ডন থেকে এনেছিলাম কদিন সবাই মিলে ফুর্তি করবো বলে। লেকে মাছ ধরবো, নৌকায় ঘুরে বেড়াবো আর বনের ভেতর ফাঁদ পেতে খরগোশ শিকার করবো। তুমি সব ভেস্তে দিয়েছো তোমার বিপদের কথা বলে। তোমাকে আমি বলছি, এক্ষুণি যদি সব কথা খুলে না বলে এই ঝড়ের ভেতরই আমি ওদের নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবো।

এটা বুঝি বাড়ি না আলফ্রেড? শার্লি থমথমে গলায় বললো, বড় বোন হিসেবে তোর ওপর কি আমার কোনো দাবি নেই? আমি কি তোকে বলেছি আমার এখানে কারও ফুর্তি করা নিষেধ? সেই ছোটবেলা থেকে দেখছি সব সময় তুই আমাকে শাসন করিস।–আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন।

এইটুকু বলে শার্লি টিস্যু পেপার দিয়ে নাক ঝাড়লো। ওর চোখ দুটো ছলছল করছিলো, বুঝি এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে।

তোমার পচাত্তর বছর বয়স হয়েছে শার্লি। এখনও তোমার ছিচকাঁদুনে স্বভাবটা গেলো না। নাও খুব হয়েছে। এবার লক্ষী মেয়ের মতো বলে ফেলো তো তোমার বিপদটা কী?

আরেকবার ভালো করে নাক ঝেড়ে শার্লি বললো, তুই তো নাস্তিক হয়ে গেছিস, দিনক্ষণ কিছু মানিস না। এসব কথা যখন তখন বলা যায় না। সূর্যকে সাক্ষী রেখে অন্ধকার জগতের বাসিন্দাদের নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। ভেবেছিলাম রাতে বলবো। দেখছি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্যরকম। তিনি চান এখনই তোমাদের বলি। সে জন্য এই ভরদুপুরে সূর্যকে তিনি মেঘের সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখেছেন। শোন তা হলে, তোমরাও শোনো সবাই।

আমরা সবাই কান খাড়া করলাম। শার্লি বললো, আরও কাছে এসে বসো। আমার বলতেও ভয় হচ্ছে।

আমরা কোনো কথা না বলে ওর হুকুম তামিল করলাম। শীলা আর জেন ওর দুপাশে কার্পেটের ওপর বসলো। শার্লি ওর আরাম চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বললো, ঘটনাটা প্রথম ঘটেছে আমার গত জন্মদিনের তিনদিন আগে। রাতে আমি দোতলার বেডরুমে শুয়ে আছি। তখন রাত দুটো বাজে। নিচের তলায় শুনি কারও পায়ের শব্দ। একজন নয়, মনে হলো দুতিনজন। ফিসফিস করে কথা বলার শব্দ শুনলাম। নিচে আমার কাজের মেয়ে মেরি থাকতো। মেয়েটার স্বভাব চরিত্র ভালো ছিলো না।

আলফ্রেড বললো, ছিলো না বলছো কেন, মেরি এখন তোমার কাছে থাকে না? ·

হায় ঈশ্বর! তবে আর বলছি কী! কাষ্ঠ হেসে শার্লি বললো, মেরি তো কবেই ভেগেছে। তারপর আরও ডজনখানেক এসেছে আবার চলেও গেছে। কাল চাকরি দিলাম মেক্সিকান মেয়ে কারমেলাকে। আমার বাড়ির দুর্নামের কথা শুনেছে কারও কাছে। বলেছে রাতে থাকতে পারবে না। রোজ সন্ধ্যা ছটায় চলে যাবে আবার সকালে আটটায় আসবে। মাইনে সপ্তায় একশ পাউন্ড। আমি তাতেও রাজি ছিলাম। এই তো আজ এখন পর্যন্ত এলো না। আবার আমাকে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে।

ঠিক মাছে দিও। এখন বলল ওরা পালাচ্ছে কী জন্য?

পালাবার মতো ঘটনা ঘটছে বলেই পালাচ্ছে। ওরা আমাকে একা পেতে চায়। আমাকে দিয়ে ওদের কোনো কাজ করিয়ে নিতে চায়। জানে এ তল্লাটে আমার মতো পবিত্র আত্মা কারও নয়। সেটা দখল করতে চায় ওরা।

হাজার বার ওরা ওরা বোলো না তো? আলফ্রেড বিরক্ত হয়ে বললো, ওরা কে সেটাই তো শুনতে চাইছি!

এখনও বুঝতে পারিসনি ওরা কারা?

না পারিনি। তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাইছো ওরা ভূত!

না, ঠিক ভূত নয়। শুকনো গলায় শার্লি বললো, ওরা হচ্ছে অতৃপ্ত প্রেতাত্মা। শার্লির কথা শুনে জেন একটু নড়েচড়ে বসলো। ফায়ার প্লেসের আগুনের আঁচ কমে গিয়েছিলো। পাশে রাখা টুকরো করা শুকনো কাঠ ওতে গুঁজে দিলো শীলা। আলফ্রেড গম্ভীর হয়ে বললো, কেন তোমার মনে হলো ওরা অতৃপ্ত আত্মা?

রাতে যতবার শব্দ শুনে নিচে এসেছি, কাউকে কোথাও দেখেনি। কাজের মেয়েরাও আমার মতো ওদের চলাফেরার শব্দ শুনেছে কিন্তু কিছু দেখেনি। আমাদের প্রতিবেশী ব্রাউনদের বাড়ির কয়েকজন দেখেছে আমার বাড়িতে অনেক রাতে অন্ধকারে আলোর টুকরো ঘুরে বেড়ায়। গির্জার ফাদার ফার্নান্দোও দেখেছেন। তাঁকে এনে একদিন জপতপ করালাম। তাতেও কিছু হলো না। ফাদার ফার্নান্দো বললেন খুব শক্তিশালী আত্মা এবং দুষ্ট প্রকৃতিরও বটে।

অন্যসব বাড়িতে না গিয়ে তোমার বাড়িতে কেন ওরা আসে? জানতে চাইলে আলফ্রেড।

জেন বললো, তুমি শিওর হচ্ছে কী করে ওরা খারাপ আত্মা?

ভালো আত্মা মানুষকে কখনও ভয় দেখায় না।

আত্মা ছাড়া কি অন্য কিছু হতে পারে না?

অন্য কী হতে পারে?

ধরো আউটার স্পেস থেকে মানুষের চেয়ে শক্তিশালী অন্য কোনো প্রাণী আসতে পারে। ইটিতে যেমন দেখিয়েছে?

হুঁ, ভাববার কথা বটে। এই বলে শার্লি চিন্তামগ্ন হলো। বললো, ভিন্ন গ্রহ থেকে অদৃশ্য প্রাণী আসুক আর না-ই আসুক এটুকু বলতে পারি–তারা এ পৃথিবীর রক্তমাংসে গড়া মানুষ নয়।

.

**৮. রহস্যময় ফাদার ফার্নান্দো**

দুপুরের পর থেকে ঝড়ো বাতাস শুরু হয়েছিলো। বিকেল থেকে শুরু হলো বৃষ্টি। ঝমঝমে বৃষ্টি নয়, বাতাসের সঙ্গে দমকা বৃষ্টি। মাঝে মাঝে জোরে হচ্ছিলো, মাঝে মাঝে থেমেও যাচ্ছিলো। বরফ পড়ার পূর্বলক্ষণ এটা।

দুপুরে লাঞ্চ পর্যন্ত শার্লির সঙ্গে আমাদের বৈঠক হলেও বোঝা গেলো না রাতে ওর বাড়িতে আসলে কারা আসে। শার্লি প্রথমে অতৃপ্ত আত্মার কথাই বলেছিলো। জেনের কথা শুনে ভিন গ্রহের আগন্তুকের সম্ভাবনাও নাকচ করে দেয়নি। শীলা একবার বলেছিলো, কোনো খারাপ লোক হতে পারে। শার্লি ওর কথা উড়িয়ে দিয়েছে। শেষে ঠিক হয়েছে রাতে আমরা না ঘুমিয়ে পাহারা দেবো। দেখবো কারা আসে।

রাত এখন দশটা। আটটার ভেতর সবাই ডিনার সেরে ফেলেছি। শার্লির কাজের মেয়ে কারমেলা আর আসেনি। তাতে খুব একটা অসুবিধেও হয়নি। আমাদের পেয়ে শার্লি এত খুশি হয়েছিলো যে মনের মতো করে নিজেই রান্না করেছে। শীলাও ওকে রান্নায় সাহায্য করেছে। জেন আমাদের সঙ্গে বসে ভিসিআরে হরর ছবি দেখেছে। শার্লির ছবির সংগ্রহ দেখার মতো বটে। রহস্য আর ভৌতিক বইয়ের সংখ্যা হাজারের কাছে হবে।

সাড়ে নটার সময় জোর করে শার্লি আর আলফ্রেডকে ওপরে শুতে পাঠিয়ে আমরা নিচের তলায় আমাদের ঘরে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে গল্প করছিলাম। রাত জাগতে হবে বলে দুপুরে খাওয়ার পর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়েছি। একটু আগে আমরা চারজন বড় মগভর্তি গরম কফি খেয়েছি। বাইরে বৃষ্টি ততক্ষণে থেমে গেছে। তবে আকাশের মেঘ কাটেনি। আবহাওয়ার বুলেটিনে বলেছে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর বরফ পড়বে। বরফ পড়ার ঠিক আগে শীতটা ভীষণ ধারালো হয়।

ভিকি বললো, নিক তুই কি বিশ্বাস করিস গলায় ক্রস ঝোলানো থাকলে খারাপ আত্মা কাছে আসে না?

শার্লি শুতে যাওয়ার আগে আমাদের চারজনের গলায় চারটি ক্রস ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে। বলেছে–নাস্তিকরা এসব বিশ্বাস করে না। আমাকে যে এখনও ওরা দখল করতে পারেনি সেটা এই ক্রসের জন্য। এখান থেকে যাওয়ার সময় খুলে রেখে যেও। কিন্তু এখানে যে কদিন থাকবে তোমাদের ভালোমন্দের দায়িত্ব আমার। কারও কিছু

হলে আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে।

ভিকির কথা শুনে মনে হলো গলায় ক্রস ঝোলানোটা ওর পছন্দ হয়নি। বললাম, আমি এসব বিশ্বাস করি না।

তা হলে গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিস কেন, খুলে ফেল?

আমি বললাম, ভিকি, একজন বুড়ো মহিলা আমাদের মঙ্গলের কথা ভেবে বিশ্বাস করে এটা পরিয়ে দিয়েছে। সে জানে আমরা তার বিশ্বাসের অমর্যাদা করবো না। কী দরকার খুলে–থাক না।

মনে হচ্ছে তুই ভয় পেয়েছিস। ভিকি খোঁচা মেরে বললো, আমরা কেউ ধর্ম মানি না। কেন মিছেমিছি খৃষ্টানদের একটা ক্রস অযথা ঝোলাতে যাবো?

শীলা বললো, নিক ঠিকই বলেছে ভিকি। এটা যদি খুলে ফেলি শার্লি মনে কষ্ট পাবে। দুদিনের জন্য আমরা বেড়াতে এসে অসহায় এক বুড়িকে কেন কষ্ট দিতে যাবো?

জেন বললো, আমি অন্য একটা কারণে এটা খোলার পক্ষপাতী। যদি সত্যিই অতৃপ্ত আত্মারা রাতে এ বাড়িতে আসে তা হলে দেখা যাবে ক্রসের জন্যেই হয়তো তারা আমাদের কাছে ঘেঁষছে না। আমার অতৃপ্ত আত্মা দেখার ভারি সখ।

কী করে দেখবে? আমি হেসে বললাম, ওরা তো অশরীরী, চোখে দেখা যায় না।

তা হলে আমাদের কপালটাই খারাপ বলতে হবে। বাড়ি থেকে বেরোলাম হন্টেড ক্যাসল্ দেখবো বলে। সেটা দেখা হলো না। এখানে এলাম ভূতের দেখা পাবো বলে। তাও কপালে জুটবে না?

জুটতেও পারে। আমি রহস্য করে বললাম, গোটা রাত পড়ে আছে। দেখতে না পেলেও শুনতে তো পাবে। শার্লি বলেছে ওদের দেখা যায় না, শোনা যায়।

জেন বললো, শুনতে পেলেও মন্দ হয় না।

শীলা বললো, নিক, তুমি ঠাট্টা করছো কেন? তোমার কি মনে হয় না এটা কোনো খারাপ লোকের কাজ?

শীলাকে বললাম, কথাটা ভেবে দেখার মতো। এমন তো হতেই পারে শার্লিকে একা পেয়ে ভয় দেখিয়ে ওর বাড়িটা দখল করতে চাইছে। সমুদ্রের তীরে পাহাড়ের ওপর এ ধরনের বাড়ি স্মাগলারদের জন্যে তো স্বর্গ। গত বছর নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড় নামে একটা বাংলা রহস্য উপন্যাস পড়েছিলাম। ওখানে ছিলো এরকম একটা বাড়ি দখল করার জন্য বদমাশরা ভূতের ভয় দেখিয়ে বাড়ির লোকদের তাড়াতে চাইছে। চোখ কান খোলা রাখলে আমরাও শার্লির বাড়ির ভৌতিক উৎপাতের রহস্য উঘাটন করতে পারবো।

ভিকি উত্তেজিত গলায় বললো, তুই তা হলে বলছিস, হার্ডি সিক্স-এর মতো আমরা হার্ডি ফোর নামে একটা দল করতে পারি?

তা পারিস। আমি হেসে বললাম, দল পাকাবার জন্য তুই উপযুক্ত লোক।

আমি তাহলে টিম লিডার হবো।

জেন বললো, তুমি কেন টিম লিডার হবে? শীলা নয় নিক হবে টিম লিডার।

ভিকি তবু বললো, গায়ের জোরে আমার সঙ্গে কেউ পারবে না।

বুদ্ধির জোরে তুমি ওদের সঙ্গে পারবে না।

আমি বললাম, জেন, আমি সারেন্ডার করছি। ভিকিই আমাদের লিডার হোক। তবে এক শর্তে।

কী শর্ত? ব্যগ্র হয়ে জানতে চাইলে ভিকি।

শার্লির দেয়া ক্রসটা তুই গলায় ঝুলিয়ে রাখবি।

ভিকি উল্লসিত হয়ে বললো, একটা কেন, টিম লিডার হওয়ার জন্য দশটা ক্রস গলায় ঝোলাতেও রাজি আছি আমি।

জেন বললো, এবার টের পাচ্ছো তো ভিকি, বুদ্ধি কার বেশি?

ভিকি বললো, নিশ্চয় সারেন্ডার করে নিক বুদ্ধিমানের কাজ করেছে।

জেন হেসে বললো, তা নয় ভিকি। নিক তোমাকে ঠিকই গলায় ক্রস ঝুলিয়ে ছেড়েছে।

তাই নাকি! জেনকে খোঁচা দিয়ে ভিকি বললো, তোমার তো দারুণ বুদ্ধি! এত বুদ্ধি নিয়ে রাতে ঘুমাও কী করে?

বেশি হলে তোমার মতো অপাত্রে বাড়তিটুকু ঢেলে দেই।

আমরা সবাই এমনভাবে শুয়েছিলাম যাতে কাঁচের জানালাগুলোর ওপর নজর রাখা যায়। তখন এগারোটার মতো হবে। হঠাৎ বাইরে খুট করে শব্দ হলো। আমরা সবাই কান খাড়া করলাম। ভিকি হাত বাড়িয়ে আমাকে খোঁচা দিলো।

তারপর বাইরের কাঠের বারান্দায় মনে হলো কে যেন খটখট করে হাঁটছে। জেন ভাঙা গলায় আর্তনাদ করে উঠলো–কে?

সঙ্গে সঙ্গে পায়ের আওয়াজ থেমে গেলো। শীলা চাপা গলায় ওকে ধমক দিলো–দিলে তো সব নষ্ট করে। চিৎকার করতে কে বলেছিলো তোমাকে?

ভিকি গম্ভীর হয়ে বললো, শীলা, জেনকে যদি কিছু বলতে হয় আমি বলবো। মনে রেখো, টিম লিডার আমি।

আমি চেইন খুলে স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরোলাম। ওদের বললাম, বাইরের বারান্দা থেকে একটু ঘুরে আসি।

শীলা বললো, একা যেয়ো না। আমিও যাবো।

আমার মতো স্লিপিং ব্যাগের চেইন খুলে শীলাও বেরিয়ে এলো। দুজনে বারান্দায় এসে দেখি কেউ কোথাও নেই। শার্লির পোষা বিড়াল দুটো হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে মিয়াও বলতেই শীলা লাফ দিয়ে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, ওটাতো শার্লির বেড়াল। ভয় পাচ্ছো কেন?

শীলা লজ্জা পেয়ে বললো, ভয় নয়, চমকে উঠেছিলাম।

আমরা দুজনে ঘরে ফিরে এলাম। ভিকি বললো, এভাবে শুয়ে থাকলে এমনিতেই ঘুম এসে যাবে।

জেন বললো, আমারও ঘুম পাচ্ছে।

শীলা বললো, তোমাদের ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়ো। আমি আর নিক এখন ঘুমোচ্ছি না।

ওরা আর কোনো কথা বললো না। কিছুক্ষণ পর ভিকির ফিনফিনে নাক ডাকার শব্দ শুনে শীলা বললো, ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। চলো বাইরের ঘরে গিয়ে বসি।

আমি কোনো কথা না বলে শীলার সঙ্গে ড্রইংরুমে এসে বসলাম। শীলা বললো, কফি খাবে আরেক কাপ?

বললাম, পেলে মন্দ হতো না।

শীলা উঠে গিয়ে কফি বানিয়ে আনলো। বললো, বাড়িতে এক কাপের বেশি দুকাপ কফি খেলেই মা কী চাচামেচিই না করে! মনে হয় গোটা সভ্যতা বুঝি রসাতলে গেছে।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, আমার মাও বেশি কফি খাওয়া পছন্দ করে না।

পৃথিবীর সব মা-ই একরকম।

তুমি যখন মা হবে তখন তুমিও তোমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এরকম করবে।

আমাকে দেখে কি তোমার তাই মনে হয়?

মানুষ কি সব সময় একরকম থাকে?

তার মানে তুমিও একদিন বদলে যাবে।

জানি না, হয়তো হবো।

তখন আমাকে আর বন্ধু ভাববে না।

যদি সত্যিকারের বন্ধুত্ব থাকে কখনও তা পুরোনো হয় না।

আমাদের বন্ধুত্ব কি সত্যিকারের?

নিশ্চয়ই শীলা, তোমার কি সন্দেহ আছে।

শীলা কিছুক্ষণ কোনো কথা বললো না। চুপচাপ কী যেন ভাবলো। তারপর বললো, তুমি খুব ভালো নিক। তোমার মতো বন্ধু পেয়ে আমি গর্বিত।

ড্রইংরুমের অন্ধকারে বসেছিলাম আমরা দুজন। একটু পর বাইরে আবার শব্দ হলো। খট, খট, খট, খট বুট পায়ে কে যেন হাঁটছে। শব্দ শুনে মনে হয় মানুষের পায়ের আওয়াজ নয়। ঠিক ড্রইংরুমের দরজার সামনে এসে শব্দটা থেমে গেলো। যেন বন্ধ দরজা ভেদ করেই সে ঘরে ঢুকবে। ফিসফিস করে শীলাকে বললাম, চলো দেখে আসি।

শীলা আমার হাত ধরলো। মনে হলো এবার ও ভয় পেয়েছে। শব্দটা আসলেই অন্যরকম ছিলো। যেন কোনো নরকঙ্কাল হেঁটে বেড়াচ্ছে। কথাটা মনে হতেই মেরুদন্ড বেয়ে ঠান্ডা রক্তের স্রোত নেমে এলো। শিরশির করে উঠলো সারা শরীর।

তবু আমরা উঠলাম। দুজন একসঙ্গে পা টিপে টিপে এসে ঝট করে দরজাটা খুলোম। যা ভেবেছিলাম–কোথাও কেউ নেই ।

শীলা বললো, সত্যিকারের মানুষ হলে এত তাড়াতাড়ি লুকোবে কোথায়?

দরজা বন্ধ করে আবার ড্রইংরুমে এসে বসলাম, ভিকি জেনকে ডাকবে?

থাক, কাজের চেয়ে ওরা কথাই বলে বেশি।

ঠিক বলেছো। তবু ভিকি খুব মজার ছেলে।

জেনের মনটাও সুন্দর।

না হলে কি আমাদের বন্ধু হতে পারতো?

আমি কথা না বলে শুধু হাসলাম। আমাদের চারজনের বন্ধুত্ব নিয়ে স্কুলে টিচাররাও হাসাহাসি করেছে। এখন নিশ্চয় হার্ডি ফোর বলে সবাই ঠাট্টা করবে।

সেই রাতে আরও অনেকক্ষণ জেগেছিলাম আমি আর শীলা। দুজনে নিচু গলায় কথা বলছিলাম। আলফ্রেডের কথা মনে হলো। ও বলেছিলো, আমার নিজের জগতের কথা। সেই রাতে মনে হয়েছিলো শীলাই আমার জগৎ। এটা আমাদের নিজস্ব জগৎ। এখানে অন্য কারও জায়গা নেই। মা আর দিব্যেন্দুর নিশ্চয় এমন একটা জগৎ আছে। আমার উচিত হবে না দুজনের মাঝখানে দেয়াল হয়ে থাকা।

পরদিন ভিকি আমার ঘুম ভাঙালো। বললো, সবার ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। বাকি শুধু তুই আর শীলা।

ঘুম-জড়ানো চোখে জিজ্ঞেস করলাম–কটা বাজে ভিকি?

বেশি নয়, মাত্র সাড়ে দশটা।

বলিস কী! বলে লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম। আগে ডাকলি না কেন?

তোর প্রিয় বান্ধবী শার্লি বারণ করলো যে! আহা, তোর জন্য বুড়ির কত ভাবনা। বলে, বাছা আমার সারারাত জেগেছে, আর একটু ঘুমোক। সত্যি নাকি দোস্ত, তুই কি সারারাত জেগে ছিলি?

সারারাত কেন হবে? হাই তুলে বললাম, তিনটার দিকে শুয়েছি। শীলা উঠেছে?

ওকে ওঠানোর দায়িত্ব জেনের। শীলাও কি তোর সঙ্গে রাত জেগেছে?

আমি কোনো কথা না বলে বাথরুমে ঢুকলাম। একবারে তৈরি হয়ে ডাইনিং টেবিলে এসে দেখি শীলা বসে আছে। ওর চোখ দুটো সামান্য ফোলা, সাদা-কালো নকশা করা কার্ডিগান গায়ে, ভারি সুন্দর লাগছিলো।

শার্লি আর আলফ্রেড ড্রইংরুমে বসে ওদের ছোটবেলার কথা বলছিলো। নাশতা খেতে খেতে শুনলাম শার্লি বলছে, তোর মনে আছে আলফ্রেড, একবার তুই আর তোর আরেক বন্ধু বাবার পকেট থেকে দুই পাউন্ড চুরি করে সিনেমা দেখেছিলি? ফেরার পর কী মারটাই না খেলি! তোকে বাঁচাতে গিয়ে আমিও মার খেয়েছিলাম।

আলফ্রেডের মুখে নরম হাসি। বললো, মনে থাকবে না কেন শার্লি, মা মারা যাওয়ার পর তুমি আমাকে মার মতোই আগলে রাখতে। গায়ে এতটুকু আঁচ লাগতে দাওনি।

তুই নিজে কি কম করেছিস? একবার পাড়ার এক ছেলে আমাকে নিয়ে একটা বাজে কথা বলেছিলো। তুই গিয়ে ওর নাক ফাটিয়ে দিয়ে এলি। তারপর কত ঝামেলা!

সব মনে আছে শার্লি। নিচু গলায় বললো আলফ্রেড-তোমার মতো বোন পাওয়া ভাগ্যের কথা।

শার্লি ভাইয়ের গালে চুমু খেয়ে বললো, তোর মতো ভাই কটা বোনের আছে শুনি?

আমি শীলার দিকে তাকালাম। শীলা মুখ টিপে শুধু হাসলো । ভিকি আর জেন বাইরে কী নিয়ে হল্লা করছে। এখান থেকে ওদের গলা শুনতে পাচ্ছিলাম।

নাশতা সেরে বাইরে এসে দেখি ঝলমলে বোদের ঝরণাধারায় ভাসছে ছোট্ট কার্ডিগান শহর। দূরে শান্ত নীল কার্ডিগান উপসাগর কাঁচের টুকরোর মতো পড়ে আছে। শার্লির বাড়িটা বেশ উঁচু একটা পাহাড়ের ওপর। কাছাকাছি কারও বাড়ি নেই। শুধু একটা গির্জা রয়েছে পাশের নিচু টিলায়। উত্তর আর পূর্ব দিকে উঁচু পাহাড়, সেখানে শুধু গাছের সারি, দু একটা ছাড়া কোনো গাছে পাতা নেই।

আমাদের বেরোতে দেখে ভিকি এগিয়ে এসে বললো, তদন্ত শুরু করার আগে আশেপাশে একটু ভালো করে ঘুরে দেখা দরকার, লোকজনের সঙ্গে কথাও বলা দরকার, সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়তে পারে।

শীলা হেসে বললো, এসব করার জন্য শার্লি আর আলফ্রেডের অনুমতি নেয়া দরকার।

অনুমতি আগেই নেয়া হয়েছে। বিচক্ষণ দলনেতার মতো বললো ভিকি। ঘুম থেকে উঠে যথারীতি রিপোর্ট করাও হয়ে গেছে। কাল রাতেও ওরা এসেছিলো শুনে শার্লি আলফ্রেডকে একচোট নিয়েছে।

শীলা অবাক হয়ে জানতে চাইলো–একচোট নেয়ার মতো আবার কী ঘটলো?

শার্লির কথা আলফ্রেড বোধহয় বিশ্বাস করেনি। রাতে নিশ্চয় এ নিয়ে ওদের কথা হয়েছে। আমার কথা শুনে ও একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আলফ্রেডের ওপর–বলিনি ওরা রোজ রাতে আসে। আমার কথা বিশ্বাস হয়নি। এরা তো সব ফেরেশতার মতো ছেলেমেয়ে। বল, এরাও বানিয়ে বলেছে। তুই একটা–

শার্লির গলা আর বলার ঢং নকল করে ভিকি ওর কথাগুলো আমাদের শোনাবার আগেই আমরা সবাই হেসে খুন হলাম। আমাদের বাঁধভাঙ্গা হাসির শব্দ শুনে ভেতর থেকে শার্লি আর আলফ্রেড বেরিয়ে এলো হাত ধরাধরি করে। প্রসন্ন মুখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওরা আমাদের দেখছিলো। শার্লি বললো, ভারি চমৎকার আবহাওয়া আজ। তোমরা ঘুরে এসো। বেশিক্ষণ থাকবে না। আমি তোমাদের জন্য বাঁধাকপি, মাংসের সুপ আর গলদা চিংড়ি রান্না করছি।

ভিকি বললো, তা হলে তো ভালোমতো ঘুরে খিদেটা বাড়িয়ে আনতে হয়।

শার্লি হেসে বললো, কার্ডিগানের বাতাসে ঘন্টায় ঘন্টায় লোকের খিদে পায়।

আমরা চারজন কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পাথরে বাঁধানো রাস্তাটা পাহাড়টাকে এক পাক দিয়ে নিচে নেমে গেছে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ছোট বড় এঁচোলো পাতার পাইন গাছ গজিয়েছে। মাটির অভাবে অনেক পাইন গাছ বেঁটে বনসাই হয়ে গেছে, ভিকি আমাকে বললো, আমাদের তদন্ত কোত্থেকে শুরু হবে কিছু ভেবেছিস? আমার মাথায় তো কিছু ঢুকছে না।

আমি হাসি চেপে বললাম, তুই দলের লিডার। তুই ঠিক করবি কোত্থেকে আমরা শুরু করবো। আমি কীভাবে জানবো?

জেন হেসে বললো, ভালো বলেছো নিক। এবার ভিকি লিডার হওয়ার মজা টের পাবে।

ভিকি বিরক্ত হয়ে বললো, আহা লিডাররা কি ডেপুটিদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারবে না?

নিশ্চয় পারবে। শীলা বললো, গোড়াতেই একটা ভুল করেছি আমরা। প্রথমে আমাদের উচিত ছিলো শার্লির বাড়িটাকে ভালোভাবে ঘুরেফিরে দেখা।

অপ্রস্তুত হয়ে ভিকি বললো, কথাটা আমিও ভেবেছিলাম। পরে ভুলে গেলাম।

জেন বললো, জালিয়াতি কোরো না ভিকি। আমরা পরামর্শ দেবো আর তুমি বলবে কথাটা তুমি আগেই ভেবেছো–এরকম বললে কোনো পরমার্শ জুটবে না।

আহত গলায় ভিকি আমাকে নালিশের গলায় বললো, সহকর্মীদের কাছ থেকে এতটা অসহযোগিতা পেলে আমাকে লিডারের পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে।

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, তুই অযথা চটছিস। বন্ধু হিসেবে জেন একটু ঠাট্টাও করতে পারবে না!

ঠিক আছে, জেন না হয় ঠাট্টা করছে বুঝলাম। তুই কেন এত দাম বাড়াচ্ছিস? কাল শার্লি যেসব কথা বলেছে সেখান থেকে কু খুঁজে বের কর।

সকাল থেকে সেটাই ভাবছি। ভেবে কোনো কূল কিনারা না পেয়ে তবেই তো কথাটা তোকে বলেছি।

তোর নিজের কী মনে হয়?

কাল রাতে আমরাও শব্দ শুনেছি। গিয়ে দেখেছি কোথাও কেউ নেই।

তোদের ঘুমোনোর পরও শব্দ হয়েছে।

এই শব্দের উৎসটা খুঁজে বের করতে হবে।

শীলা বললো, কারণ জানলে উৎস খুঁজে বের করাও সম্ভব হবে।

আমি বললাম, আগে তা হলে জানা দরকার শার্লি যদি ভয় পেয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, সেক্ষেত্রে কে বা কারা লাভবান হবে।

জেন বললো, আশেপাশে লোকজনও তো কেউ নেই। কাকে জিজ্ঞেস করবো?

আমি বললাম, গির্জার ফাদার ফানান্দোকে দিয়ে শুরু করতে পারি।

ভিকি হেসে বললো, এতক্ষণে একটা কাজের কথা বললি।

গিজার পাশেই থাকে ফাদার ফার্নান্দো। ছোট্ট ছবির মতো কাঠের বাড়ি। আমাদের দেখে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। আমরা সুপ্রভাত বলতে ফাদারও সুপ্রভাত জানিয়ে বললো, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন বাছারা।

ফাদারকে বললাম, আমরা লন্ডনে থাকি। শার্লি উডওয়ার্ডের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি ওর ভাই আলফ্রেডের সঙ্গে।

ফাদার হেসে বললো, লন্ডন থেকে এখানে কেউ বেড়াতে আসে না। তবে বেড়াবার জন্য কার্ডিগান চমৎকার জায়গা। এসো, ভেতরে এসে বসো।

ছোট্ট ছিমছাম করে সাজানো বসার ঘর। আমাদের বসিয়ে ফাদার গেলো চা বানাতে। ভিকি চাপা গলায় বললো, ফাদার বুঝে গেছে আমরা যে তদন্ত করতে এসেছি।

একটু পরেই ফাদার একটা ট্রেতে করে পাঁচ কাপ চা বানিয়ে আনলো–আমার কোনো কাজের লোক নেই। সব কাজ আমি নিজেই করি।

শীলা বললো, আপনার অসুবিধে না হলেও শার্লির খুব অসুবিধে হচ্ছে। এ বয়সে বাড়ির সব কাজ করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ফাদার একটা চুরুট ধরালো। একগাল ধোয়া ছাড়তেই সারা ঘর তামাকের কড়া গন্ধে ভরে গেলো। বললো, শার্লি আমাকে বলেছিলো বটে ওর বাড়িতে কাজের লোক বেশিদিন থাকে না।

আমি বললাম, তার কারণও নিশ্চয় আপনি জানেন।

হ্যাঁ, শার্লি বলেছিলো রাতে নাকি কী সব অতৃপ্ত আত্মা আসে ওর বাড়িতে। ওরা নাকি ওকে দিয়ে ওদের কোন কাজ করিয়ে নিতে চায়।

আপনার কি মনে হয় না ও বাড়ির ওপর কোনো খারাপ আত্মার নজর পড়েছে?

শার্লিকে আমি বলেছিলাম এটা ওর মনের ভুল। কিংবা কোনো খারাপ লোক হতে পারে। শার্লির বদ্ধমূল ধারণা এসব হচ্ছে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী অশুভ কোনো শক্তির কাজ।

জেন বললো, আপনি শার্লির বাড়ির খারাপ আত্মা তাড়াবার কোনো ব্যবস্থা নেননি?

শার্লিকে আমি বলেছি কোনো ওঝাকে খবর দিতে। আমি শুধু ওকে একটা ক্রস দিয়েছি সব সময় গলায় পরে থাকার জন্য।

ভিকি বললো, আপনি কি বিশ্বাস করেন না শার্লির বাড়িতে খারাপ আত্মা ভর করেছে?

আমি বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনোটাই করি না। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা মেলে না।

আচ্ছা ফাদার–একটু ইতস্তত করে আমি বললাম, শার্লির বাড়ির ওপর আত্মা ছাড়া কোনো মানুষেরও তো নজর পড়তে পারে।

ফাদার হেসে বললো, একশবার পারে। সত্যি কথা বলতে কি শার্লিদের বাড়িটা মাস তিনেক আগে জন হলওয়েল কিনতেও চেয়েছিলো। বলেছিলো সস্তায় পেলে কিনব। নাকি কী সব পরিকল্পনা আছে ওর।

তারপর?

শার্লির সঙ্গে জন কথা বলেছিলো। দাম শুনে শার্লি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি বুঝি না শার্লি কেন একা এ বাড়ি আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাইছে।

জন হলওয়েলের পেশা কী?

কিছুই করে না। একা বুড়ো মানুষ। বাপদাদারা জমিদার ছিলো, সম্পত্তি আছে অনেক। এককালে নাটকের দল করে অনেক পয়সা উড়িয়েছে। এখন নিজের খেয়াল খুশিমতো নানান দেশ ঘুরে বেড়ায়।

কোথায় থাকেন?

এখান থেকে পনেরো মিনিটের রাস্তা। বাদিকে নেমে সোজা চলে যাবে সমুদ্রের কাছে। হলওয়েল ক্যাসূল বললে সবাই দেখিয়ে দেবে।

ফাদারের বাড়ি থেকে আমরা যখন বেরোলাম তখন প্রায় বারোটা বাজে। শীলা বললো, হলওয়েলের বাড়িতে এখন যাওয়া কি ঠিক হবে? একেবারে লাঞ্চ টাইম।

আমি বললাম, বিকেলে যেতে পারি। আপাতত আমাদের শার্লির বাড়িতে ফেরা দরকার। একটু ভালোমতো দেখতে চাই, ওর বিশেষ কোনো আকর্ষণ আছে কিনা।

যেতে যেতে ভিকি বললো, ফাদার ফার্নান্দোর সঙ্গে কথা বলে তোর কী মনে হলো!

রহস্যময় ব্যক্তি। শার্লি ওকে বাড়িতে ডেকে মন্ত্রট পড়িয়েছে, ও বলেছে বাড়ির ওপর খুব শক্তিশালী আর দুষ্ট প্রকৃতির আত্মা ভর করেছে। এখন বলছে অন্য কথা।

তোর কি মনে হয় ফাদার হলওয়েলদের লোক হতে পারে? মনে হলো ফাদার নিজেও চায় না শার্লি এ বাড়িতে থাকুক।

হতে পারে। ভিকির সঙ্গে কথা আর বাড়ালাম না। আমি তখন অন্য কিছু ভাবছিলাম।

.

নাটকের শেষ পর্ব

দূর থেকে শার্লির বাড়িটা দেখতে দারুণ সুন্দর। জন হলওয়েলের যদি এর ওপর নজর পড়েই থাকে ওকে দোষ দেয়া যায় না যদি না, ও ভয় দেখিয়ে শার্লিকে ওঠাতে চায়। আমি ভেবে পেলাম না দুই

ভাইবোনের এত ভাব অথচ শার্লি কেন আলফ্রেডের সঙ্গে ওর বাবার বাড়িতে গিয়ে থাকতে চায় না! এ বাড়িতে এমন কী আছে যার মায়া কাটানো শার্লির পক্ষে সম্ভব নয়?

ফাদার ফার্নান্দোর ওখান থেকে এসে শার্লির বাড়িটার চারপাশ ঘুরেফিরে ভালোমতো দেখলাম। বাড়ির নকশা যে করেছে, তার পছন্দের প্রশংসা করতে হয় । নিচের তলার সামনে ঢাকা বারান্দা, ওপরের তলায় পেছনে খোলা বারান্দা। দোতালায় বারান্দায় ওঠার জন্য ঘোরানো লোহার সিঁড়ি আছে। দোতালার বারান্দাটা বানানো হয়েছে সমুদ্রের শোভা দেখার জন্য। বাড়ির বাঁদিকে অনেক পুরোনো একটা চেস্টনাট গাছ আছে, দেখে যেন মনে হয় বাড়ির ওপর ছাতা ধরেছে।

বাইরে থেকে বাড়ি দেখা শেষ করে ভেতরে গিয়ে দেখি শার্লি কিচেনে রান্না করছে, পাশের টেবিলে বসে আলফ্রেড সালাদ বানাচ্ছে। আমাদের দেখে শার্লি হাসিমুখে বললো, বেড়ানো হলো তোমাদের?

এ বেলার মতো। বললো জেন।

খিদেও নিশ্চয় পেয়েছে?

তা আর বলতে! কার্ডিগানের বাতাস বলে কথা!

বলিনি তোমাদের, ঘন্টায় ঘন্টায় খিদে পাবে?

পাহাড়ি রাস্তায় দুঘন্টা ওঠানামা করলে খিদে লাগারই কথা। শার্লির রান্নাও দেখলাম শেষ হয়ে গেছে। ওর মুখে প্রসন্ন হাসি। মনে হয় না ওর মাথার ওপর ভয়ঙ্কর কোনো বিপদ আছে যার জন্য জীবন বিপন্ন হতে পারে। অথচ কাল ওর চেহারা দেখে মনে হয়েছিলো পৃথিবী ধ্বংসের বুঝি এক দিনও বাকি নেই।

দুপুরে বাড়িতে থাকলে যা খাই–শার্লির ওখানে দ্বিগুণ খাওয়া হলো। শুধু কার্ডিগানের বাতাস নয়, শার্লির রান্নারও গুণ আছে। ভিকি বললো, দারুণ মজার হয়েছে শামুক আর বাঁধাকপির ঝোলটা।

শার্লি হেসে বললো, রাতে তোমাদের জন্য মাংশের গুলাশ করবো।

দুপুরে খাওয়ার পর এঁটো গ্লাস ডিশ ধুতে শার্লিকে সাহায্য করলো শীলা, আর, জেন। ভিকি আর আমিও ওদের সাহায্য করতে রান্নাঘরে ঢুকেছিলাম। শার্লি চোখ পাকিয়ে বলেছে, ছেলেরা কেন রান্নাঘরে?

আমি, আলফ্রেড আর ভিকি দোতলায় বারান্দায় গিয়ে বসলাম। আলফ্রেডকে বললাম, তোমার বোনকে দেখে মনে হচ্ছে না ওর কোনো বিপদ আছে।

আলফ্রেড পাইপ ধরাতে ধরাতে বললো, তোমাদের পেয়ে ও দারুণ খুশি হয়েছে।

তুমিও বোনকে পেয়ে কম খুশি হওনি।

ওর সঙ্গে দেড় বছর পর দেখা হলো। পাইপে টান দিয়ে একগাল ধোয়া ছাড়লো আলফ্রেড। আপন মনে বললো, বুঝি না আমার সঙ্গে শার্লি কেন থাকতে চায় না।

সকালে ফাদার ফার্নান্দোর সঙ্গে কী কথা হয়েছে ভিকি সব খুলে বললো আলফ্রেডকে। শুনে মুখ টিপে হেসে আলফ্রেড বললো, কাল রাতেই টের পেয়েছিলাম আমাকে ফাঁকি দিয়ে তোমরা কিছু করার মতলব এঁটেছে।

তোমাকে ফাঁকি দিতে চাইনি আলফ্রেড। আমি বললাম, এতদিন পর তোমাকে পেয়ে শার্লি এত খুশি হয়েছে দেখে চেয়েছিলাম ওকে তুমি সঙ্গ দাও।

আলফ্রেড নরম গলায় বললো, জানি নিক। এজন্যেই তোমাকে আমি এত ভালোবাসি।

ভিকি গম্ভীর হয়ে বললো, বিকেলে আমরা হলওয়েল ক্যাস-এ যাচ্ছি জনের মতলব বোঝার জন্য। আমার ধারণা ও শার্লিকে ভয় দেখিয়ে বাড়িটা বাগাতে চায়।

আলফ্রেড বললো, ও যদি ভালো দামে বাড়িটা কিনতে চায় আমি তাতে খুশিই হবো।

কেন আলফ্রেড? জানতে চাইলাম আমি।

তা হলে শার্লি আমার কাছে গিয়ে থাকবে। ভালো দাম পেলে শার্লি মনে হয় বাড়ি বেচতে রাজি হবে।

রান্নাঘরের কাজ শেষ করে শীলা আর জেন এসে বসলো আমাদের কাছে। জেন বললো, শার্লি তোমাদের জন্য চা আনছে।

ভিকি বললো, তোমাদের জন্য বলছো কেন? তোমরা বুঝি খাবে না?

আমরা ছেলেদের মতো বেহিসেবি নই। সব সময় ক্যালোরি মেপে খাই।

ছেলেদের শরীরে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়।

মেয়েদের প্রয়োজন বুদ্ধি, যাতে করে ছেলেদের ঠিকমতো চরাতে পারে।

শার্লি চায়ের ট্রে এনে হাসতে হাসতে বললো, এরই মধ্যে ভিকি আর জেনের ঠোকাঠুকি বুঝি শুরু হয়ে গেছে।

জেন বললো, শার্লি তুমি আমাদের দলে, ভুলে গেছো বুঝি?

ভিকি বললো, বাহ, এর ভেতর দল পাকানোও শুরু হয়ে গেছে। ঠিক আছে ..আলফ্রেড আমাদের দলে।

আলফ্রেড হেসে বলল, আমি সব দলে।

শার্লি ওর সঙ্গে গলা মেলালো। আমি আর শীলা হো হো করে হেসে উঠলাম। ভিকি বললো, দলের শৃঙ্খলার স্বার্থে এখন কিছু বলছি না। তবে লন্ডনে ফিরে গিয়ে এর শোধ নেবো।

জেন কোনো কথা না বলে ওকে জিব দেখালো। সঙ্গে সঙ্গে ভিকি লাফিয়ে উঠলো জেনকে ধরার জন্য। চোখের পলকে জেন হাওয়া হয়ে গেলো। ভিকিও ওর পেছনে ছুটলো। শার্লি চেঁচিয়ে বললো, ভিকি তোমার চা ঠান্ডা হচ্ছে। কে কার কথা শোনে!

বিকেলে আমরা আলফ্রেডের গাড়ি নিয়ে বেরোলাম। ও নিজে থেকেই বললো, হলওয়েল ক্যা এখান থেকে কম দূর নয়। গাড়ি নিয়ে যাও।

ভিকির ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিলো না। আমিই গাড়ি চালাচ্ছিলাম। শীলা আমার পাশের সিটে। ভিকি আর জেন পেছনে। আসার সময় শার্লি বার বার বলে দিয়েছে। সন্ধ্যার আগেই যেন আমরা ফিরে আসি।

হলওয়েল ক্যাসল-এ গাড়িতে যেতে পঁচিশ মিনিট লেগে গেলো। অচেনা সরু পাহাড়ি রাস্তা, খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছিলো। পথে যদিও দুচারটা লোক ছাড়া গাড়ি তেমন ছিলো না–তবু ড্রাইভিং এর ব্যাপারে আমি সব সময় সাবধান। মাত্র চার মাস আগে দিব্যেন্দু আমার লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছে, ওটা খোয়ানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই।

লন্ডনের আশেপাশে যে রকম দেখা যায় তার তুলনায় হলওয়েল ক্যাসলকে বেশ গরিব গরিব মনে হলো। এমনকি আলফ্রেডের সঙ্গে কটনউড ক্যাসল্ দেখেছিলাম তার চেয়েও একটা সাদামাঠা। তবু ক্যাসল বলে কথা! বয়সও হয়েছে অনেক। সামনের পাথর বাঁধানো চত্বরে গাড়ি নামতেই ঘেউঘেউ করে ছুটে এলো অতিকায় দুই গ্রে হাউন্ড কুকুর। আমি আর শীলা কুকুর মোটেই পছন্দ করি না। ইংরেজদের কথা আলাদা। অনেকে আছে বিছানায় পোষা কুকুরের পাশে না শুলে ওদের ঘুম আসে না।

হাউন্ড দুটোর হাঁকডাকে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো সাড়ে ছফুট লম্বা এক অভিজাত চেহারার বুড়ো। দেখে মনে হলো এই জন হলওয়েল । কুকুর দুটোকে গম্ভীর গলায় শান্ত হতে বলে হলওয়েল এগিয়ে এলো গাড়ির কাছে। প্রশ্ন ভরা চোখে তাকালো আমাদের দিকে। গাড়ি থেকে নেমে বললাম, শুভ অপরাহ্ন। আমাদের ধারণা আপনিই স্যার জন হলওয়েল।

জন হলওয়েল মোটেই নাইটহুড পায়নি। তবু ইচ্ছা করেই স্যার বললাম যাতে খুশি হয়। আমার ধারণা সত্যি প্রমাণ হলো। প্রসন্ন মুখে বুড়ো বললো, আমিই হলওয়েল। তোমরা?

আমরা লন্ডনে থাকি, কার্ডিগানে বেড়াতে এসেছি। আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিলো।

এসো, ভেতরে এসে বসবে।

হলওয়েলের পেছনে পেছনে আমরা দুর্গের ভেতর ঢুকলাম। কুকুর দুটো আমাদের যে মোটেই পছন্দ করেনি মাঝে মাঝে গরগর করে জানিয়ে দিচ্ছিলো। কুকুররা নাকি বুঝতে পারে কারা ওদের পছন্দ করে, আর কারা অপছন্দ করে।

পুরোনো ভিক্টোরিয়ান যুগের এক ড্রইংরুমে এসে আমাদের সোফায় বসালো জন হলওয়েল। নিজে বসলো সিংহাসনের মতো নকশা করা উঁচু গদি মোড়া চেয়ারে। বললো, বলল, তোমাদের জন্য কী করতে পারি?

আমরা এখানে উঠেছি শার্লি উডওয়ার্ডের বাড়িতে।

কথাটা শুনে জনের কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়লো। আমি বললাম, তাঁর ভাই আলফ্রেডের সঙ্গে এসেছি। শুনলাম আপনি নাকি ওঁর বাড়িটা কিনতে চান?

কার কাছে শুনলে? শার্লি বলেছে?

না, ফাদার ফার্নান্দো। নাকি আপনার কী পরিকল্পনা আছে ওই বাড়িটাকে নিয়ে।

ছিলো, এখন আর নেই। অপ্রসন্ন গলায় জন বললো, ভেবেছিলাম, টাকাগুলো ব্যাংকে পচছে। বুড়ো মানুষের জন্য একটা হোম বানাই। শহরের ভেতর শার্লির বাড়িটাই ছিলো এর জন্য উপযুক্ত জায়গা। বললাম জায়গাটা দাও, বেশি দাম দিতে পারবো না। আরও তো অনেক খরচ আছে। ও এক পা কবরে দিয়ে বসে আছে, বলে কিনা পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের কমে বেচবে না। আমার গোটা প্রজেক্ট হচ্ছে পঞ্চাশ হাজারের। পুরো টাকা ওকে দিয়ে আমি ঘরে বসে আঙ্গুল চুষবো।

আপনি কত দিতে চেয়েছিলেন?

আমি বলেছিলাম দশ হাজার দেবো। বুড়ির এত টাকার লোভ কেন বুঝি না। ওর স্বামী ভিক্টর উডওয়ার্ড খুবই দরাজদিল মানুষ ছিলো। শার্লির জন্য ব্যাংকে যথেষ্ট টাকাও রেখে গেছে। তা ছাড়া আমার স্ত্রীর সঙ্গে শার্লির চমৎকার বন্ধুত্ব ছিলো। জায়গাটা শার্লি দানও করতে পারতো। সেক্ষেত্রে ভেবেছিলাম ওর নামেই হোমটা করবো। দান করবে কী, বাজারে বড়জোর পনেরো কুড়ি হাজার হবে ওটার দাম। বলে কিনা পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড। আমি বিরক্ত হয়ে গোটা পরিকল্পনা বাদ দিয়েছি। আপনি তা হলে বুড়োদের হোম বানাচ্ছেন না?

না, রুক্ষ গলায় জন বললো, কাদের জন্য করবো? সব তো শার্লির মতো লোভী বুড়ো। কোনো দরকার নেই।

আপনি কি দশ হাজারের কিছু বেশি দিতে পারেন না?

বললে হয়তো দশের জায়গায় তখন পনেরো দিতাম। তাই বলে পঞ্চাশ! এখনও আমি পাগল হইনি।

ঠিক আছে স্যার। এ নিয়ে আমরা শার্লির সঙ্গে কথা বলবো। আপনাকে অনুরোধ করবো এত বড় মহৎ পরিকল্পনা শার্লির একটা কথায় বাতিল করে দেবেন না।

শার্লি চায়ের ট্রে এনে হাসতে হাসতে বললো, এরই মধ্যে ভিকি আর জেনের ঠোকাঠুকি বুঝি শুরু হয়ে গেছে।

জেন বললো, শার্লি তুমি আমাদের দলে, ভুলে গেছো বুঝি?

ভিকি বললো, বাহ, এর ভেতর দল পাকানোও শুরু হয়ে গেছে। ঠিক আছে আলফ্রেড আমাদের দলে।

আলফ্রেড হেসে বললো, আমি সব দলে।

শার্লি ওর সঙ্গে গলা মেলালো। আমি আর শীলা হো হো করে হেসে উঠলাম। ভিকি বললো, দলের শৃঙ্খলার স্বার্থে এখন কিছু বলছি না। তবে লন্ডনে ফিরে গিয়ে এর শোধ নেবো।

জেন কোনো কথা না বলে ওকে জিব দেখালো। সঙ্গে সঙ্গে ভিকি লাফিয়ে উঠলো জেনকে ধরার জন্য। চোখের পলকে জেন হাওয়া হয়ে গেলো। ভিকিও ওর পেছনে ছুটলো। শার্লি চেঁচিয়ে বললো, ভিকি তোমার চা ঠান্ডা হচ্ছে। কে কার কথা শোনে!

বিকেলে আমরা আলফ্রেডের গাড়ি নিয়ে বেরোলাম। ও নিজে থেকেই বললো, হলওয়েল ক্যা এখান থেকে কম দূর নয়। গাড়ি নিয়ে যাও।

ভিকির ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিলো না। আমিই গাড়ি চালাচ্ছিলাম। শীলা আমার পাশের সিটে। ভিকি আর জেন পেছনে। আসার সময় শার্লি বার বার বলে দিয়েছে সন্ধ্যার আগেই যেন আমরা ফিরে আসি।

হলওয়েল ক্যাল-এ গাড়িতে যেতে পঁচিশ মিনিট লেগে গেলো। অচেনা সরু পাহাড়ি রাস্তা, খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছিলো। পথে যদিও দুচারটা লোক ছাড়া গাড়ি তেমন ছিলো না–তবু ড্রাইভিং এর ব্যাপারে আমি সব সময় সাবধান। মাত্র চার মাস আগে দিব্যেন্দু আমার লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছে, ওটা খোয়ানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই।

লন্ডনের আশেপাশে যে রকম দেখা যায় তার তুলনায় হলওয়েল ক্যাসলকে বেশ গরিব গরিব মনে হলো। এমনকি আলফ্রেডের সঙ্গে কটনউড ক্যাসল দেখেছিলাম তার চেয়েও একটা সাদামাঠা। তবু ক্যাসল বলে কথা! বয়সও হয়েছে অনেক। সামনের পাথর বাঁধানো চত্বরে গাড়ি নামতেই ঘেউঘেউ করে ছুটে এলো অতিকায় দুই গ্রে হাউন্ড কুকুর। আমি আর শীলা কুকুর মোটেই পছন্দ করি না।

ইংরেজদের কথা আলাদা। অনেকে আছে বিছানায় পোষা কুকুরের পাশে না শুলে ওদের ঘুম আসে না।

হাউন্ড দুটোর হাঁকডাকে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো সাড়ে ছফুট লম্বা এক অভিজাত চেহারার বুড়ো। দেখে মনে হলো এই জন হলওয়েল। কুকুর দুটোকে গম্ভীর গলায় শান্ত হতে বলে হলওয়েল এগিয়ে এলো গাড়ির কাছে। প্রশ্ন ভরা চোখে তাকালো আমাদের দিকে। গাড়ি থেকে নেমে বললাম, শুভ অপরাহ্ন। আমাদের ধারণা আপনিই স্যার জন হলওয়েল।

জন হলওয়েল মোটেই নাইটহুড পায়নি। তবু ইচ্ছা করেই স্যার বললাম যাতে খুশি হয়। আমার ধারণা সত্যি প্রমাণ হলো। প্রসন্ন মুখে বুড়ো বললো, আমিই হলওয়েল। তোমরা?

আমরা লন্ডনে থাকি, কার্ডিগানে বেড়াতে এসেছি। আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিলো।

এসো, ভেতরে এসে বসবে।

হলওয়েলের পেছনে পেছনে আমরা দুর্গের ভেতর ঢুকলাম। কুকুর দুটো আমাদের যে মোটেই পছন্দ করেনি মাঝে মাঝে গরগর করে জানিয়ে দিচ্ছিলো। কুকুররা নাকি বুঝতে পারে কারা ওদের পছন্দ করে, আর কারা অপছন্দ করে।

পুরোনো ভিক্টোরিয়ান যুগের এক ড্রইংরুমে এসে আমাদের সোফায় বসালো জন হলওয়েল। নিজে বসলো সিংহাসনের মতো নকশা করা উঁচু গদি মোড়া চেয়ারে। বললো, বলল, তোমাদের জন্য কী করতে পারি?

আমরা এখানে উঠেছি শার্লি উডওয়ার্ডের বাড়িতে।

কথাটা শুনে জনের কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়লো। আমি বললাম, তাঁর ভাই আলফ্রেডের সঙ্গে এসেছি। শুনলাম আপনি নাকি ওঁর বাড়িটা কিনতে চান?

কার কাছে শুনলে? শার্লি বলেছে?

না, ফাদার ফার্নান্দো। নাকি আপনার কী পরিকল্পনা আছে ওই বাড়িটাকে নিয়ে। ছিলো, এখন আর নেই। অপ্রসন্ন গলায় জন বললো, ভেবেছিলাম, টাকাগুলো ব্যাংকে পচছে। বুড়ো মানুষের জন্য একটা হোম বানাই। শহরের ভেতর শার্লির বাড়িটাই ছিলো এর জন্য উপযুক্ত জায়গা। বললাম জায়গাটা দাও, বেশি দাম দিতে পারবো না। আরও তো অনেক খরচ আছে। ও এক পা কবরে দিয়ে বসে আছে, বলে কিনা পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের কমে বেচবে না। আমার গোটা প্রজেক্ট হচ্ছে পঞ্চাশ হাজারের। পুরো টাকা ওকে দিয়ে আমি ঘরে বসে আঙ্গুল চুষবো।

আপনি কত দিতে চেয়েছিলেন?

আমি বলেছিলাম দশ হাজার দেবো। বুড়ির এত টাকার লোভ কেন বুঝি না। ওর স্বামী ভিক্টর উডওয়ার্ড খুবই দরাজদিল মানুষ ছিলো। শার্লির জন্য ব্যাংকে যথেষ্ট টাকাও রেখে গেছে। তা ছাড়া আমার স্ত্রীর সঙ্গে শার্লির চমৎকার বন্ধুত্ব ছিলো। জায়গাটা শার্লি দানও করতে পারতো। সেক্ষেত্রে ভেবেছিলাম ওর নামেই হোমটা করবো। দান করবে কী, বাজারে বড়জোর পনেরো কুড়ি হাজার হবে ওটার দাম। বলে কিনা পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড । আমি বিরক্ত হয়ে গোটা পরিকল্পনা বাদ দিয়েছি।

আপনি তা হলে বুড়োদের হোম বানাচ্ছেন না?

না, রুক্ষ গলায় জন বললো, কাদের জন্য করবো? সব তো শার্লির মতো লোভী বুড়ো। কোনো দরকার নেই।

আপনি কি দশ হাজারের কিছু বেশি দিতে পারেন না?

বললে হয়তো দশের জায়গায় তখন পনেরো দিতাম। তাই বলে পঞ্চাশ! এখনও আমি পাগল হইনি।

ঠিক আছে স্যার। এ নিয়ে আমরা শার্লির সঙ্গে কথা বলবো। আপনাকে অনুরোধ করবো এত বড় মহৎ পরিকল্পনা শার্লির একটা কথায় বাতিল করে দেবেন না।

শার্লিকে তোমরা চেনো না। ভয়ানক লোভী মহিলা।

জন হলওয়েলকে বিদায় জানিয়ে আমরা ফাদার ফার্নান্দোর সঙ্গে কথা বললাম। কথা আমি একাই বলছিলাম। ভিকি শীলা আর জেন শুনলো শুধু। ওদের অবাক করে দিয়ে ফাদারকে কিছু কথা বললাম আলাদাভাবে, ভেতরে ডেকে নিয়ে। ফাদারের ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। গাড়িতে আসার পথে ভিকি বললো, তুই এসব কী করছিস কিছুই তো বুঝতে পারছি না নিক।

রহস্য গলায় বললাম, সময় হলে সব বুঝবি।

আগে একটু হিন্টস দে না দোস্ত। অনুনয় করে বললো ভিকি।

আমার মনে হয় শার্লিকে ভয় দেখানোর পেছনে কোনো খারাপ লোক নেই।

তবে কি অতৃপ্ত প্রেতাত্মা?

ফাদারের ধারণা তো তাই। ফাদারকে আড়ালে ডেকে কী বললি?

কাল এসে ফাদার নিজেই ভূত তাড়াবার ব্যবস্থা করবেন।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ভিকি থমথমে গলায় বললো, আমি হলাম দলের নেতা। আমি কিছু জানবো না, সব তুই একা করবি–এরকম হলে দল করা কেন? আমি দল ভেঙে দিতে চাই।

আমি চাই না। জেন বললো, নিকের ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে।

তা হলে ভোট হোক। হোক ভোট।

তিন-এক ভোটে হেরে গিয়ে ভিকি মুখখানা আরও গোমড়া করে চুপচাপ বসে রইলো। শার্লি ওকে দেখে বললো, ভিকি, তোমার কি হয়েছে, শরীর খারাপ?

না, আমার কিছু হয়নি। শুকনো গলায় বললো ভিকি। শার্লি আলফ্রেডকে বললো, ভিকির নিশ্চয় পেট খারাপ হয়েছে। দুপুরে বলবো ভেবেছিলাম শামুকের ঝোল এতটা খেতে হয় না। পরে ভাবলাম জোয়ান ছোকরা, কিছু হবে না।

আমার ব্যাগে ওষুধ আছে। এই বলে আলফ্রেড ভিকিকে জিজ্ঞেস করলো, কতবার টয়লেটে গেছো ভিকি?

বিরক্ত হয়ে ভিকি বললো, বললাম কিছু হয়নি। আমার শরীর খুবই ভালো আছে। তোমার ওষুধ নিককে খাওয়াও। এই বলে ও ভেতরে চলে গেলো।

আলফ্রেড অবাক হয়ে আমাকে বললো, তোমার কী হয়েছে নিক?

আমি হেসে বললাম, কিছু না। ভিকি আমার ওপর রাগ করেছে।

হায় ঈশ্বর, তাই বলো! এই বলে শার্লি আর আলফ্রেড একসঙ্গে হাঁপ ছাড়লো।

আমি, শীলা আর জেন ভেতরে ঢুকলাম। ভিকি গাল ফুলিয়ে বসে আছে বিছানার ওপর। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ওকে বললাম, নিজেকে ছেলে বলে এত বাহাদুরি করিস, মেয়েদের মতো গাল ফুলোনোর স্বভাব কেন তোর?

শীলা হেসে বললো, সব মেয়ের গাল ফুলোনোর স্বভাব নেই নিক। তুমি আবার ওদের মতো ছেলে মেয়ে আলাদা করা শুরু করলে কেন?

আর বলবো না শীলা। শোন ভিকি, তোমরাও শোনো। এই বলে আমার পরিকল্পনার কথা ওদের খুলে বললাম। শুনতে শুনতে ভিকির চোখ গোল হলো, চোয়াল ঝুলে পড়লো। তারপর সব শোনার পর উত্তেজিত হয়ে বললো, দারুণ প্ল্যান করেছিস।

রাতে খাবার টেবিলে কথাটা পাড়লাম–শার্লি, আলফ্রেড যেহেতু আমাদের খুব কাছের বন্ধু, তোমাকেও আমরা বন্ধু ভাবি।

শার্লি গদগদ হয়ে বললো, তোমরা সব হীরের টুকরো ছেলেমেয়েরা। তোমাদের বন্ধু হতে পারলে আমার চেয়ে সুখী আর কে হবে বলো!

আমরা আজ জন হলওয়েলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

শার্লি হাসিমুখে জানতে চাইলো–কী বললো দেমাগী বুড়োটা?

দুঃখ করলো একটা মহৎ কাজের জন্য তোমার বাড়িটা কিনতে চেয়েছিলো, তুমি নাকি তাড়িয়ে দিয়েছে!

কেন তাড়াবো না। ওর হাড়বজ্জাত বউটা সারাজীবন আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। মরার পর আমার বাড়িতে ওর নামে বৃদ্ধনিবাস করা হবে–আহ্লাদের আর সীমা নেই!

মিসেস হলওয়েল তোমার বান্ধবী ছিলো।

কিসের বান্ধবী! দেমাগে মাটিতে পা পড়তো না। বয়ে গেছে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে।

হোমটা যদি মিসেস হলওয়েলের নামে না হয়?

শার্লি কতক্ষণ চুপ থেকে কী যেন ভাবলো। তারপর বললো, তোমরা এসব বলছো কেন? তোমরা কি ওর দলে যোগ দিয়েছো?

ছি শার্লি, তোমাকে বন্ধু বলে তোমার শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলাবো!

তাই বলো। শার্লি হেসে বললো, এসব বৈষয়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমার ভালো লাগে না। আশা করি তোমরা কিছু মনে করবে না।

এতে মনে করার কী আছে? বুঝলাম শার্লিকে সহজে কাবু করা যাবে না। মাঝরাতে যথারীতি বাইরে খটখট করে বারান্দায় কারও পায়চারি করার শব্দ হলো। ভিকি বললো, চল গিয়ে দেখি।

আমি বললাম, থাক! গিয়ে দেখবি কিছুই নেই। কাল ফাদার এসে ভূত তাড়াক। তারপর দেখা যাবে।

সকালে নাশতার টেবিলে শার্লি বললো, তোমরা কি রাতে কোনো শব্দ শোননি? আমি তো সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি।

বললাম, কাল বিকেলে ফাদার ফার্নান্দোর সঙ্গে কথা হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় তিনি আসবেন। বলেছেন শেষবারের মতো চেষ্টা করে দেখবেন।

আলফ্রেড হাসিমুখে বললো, তা হলে শার্লি, তুমি আমার সঙ্গে পেনার্থে গিয়ে থাকছে।

মুচকি হেসে শার্লি বললো, মনে হচ্ছে ঈশ্বরের অভিপ্রায় তাই। একটু থেমে ও আপন মনে বললো, যে কটা দিন বেঁচে আছি দুই ভাইবোন মিলে ছোটবেলার সোনালি দিনগুলোর কথা বলে কাটিয়ে দেবো।

আলফ্রেড আর শার্লি গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের দিকে তাকালো। শার্লি ওকে বললো, মনে হচ্ছে এরা আমার কাছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে এসেছে।

পরদিন আমরা যখন জন হলওয়েলের সঙ্গে কথা বলতে যাবো তখন আলফ্রেডও আমাদের সঙ্গী হলো। সকালে কার্ডিগান বে প্যাকার্সকে ফোন করে বলা হয়েছিলো মালপত্র নেয়ার ব্যবস্থা করতে। পনেরো মিনিটের মধ্যে দুটো বড় লরি এসে গেছে। ওদের লোকেরাই জিনিসপত্র সব বাক্সে বোঝাই করে লরিতে তুলছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে আলফ্রেড বললো, আমি সব শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি।

মৃদু হেসে বললাম, আমি প্রথম রাতেই টের পেয়েছিলাম বারান্দায় রাতে যে শব্দ করে এটা শার্লির কাজ।

এভাবে নয়, সব খুলে বলো।

তুমি লক্ষ্য করোনি শার্লির শোয়ার ঘরের মেঝেতে বেশ কয়েকটা ফুটো আছে। যখন আমরা স্লিপিং ব্যাগে ঢুকি তখন ও সরু একটা লম্বা লাঠি ঢুকিয়ে বাইরে কাঠের বারান্দায় ঠুক ঠুক করে। আমরা ব্যাগ থেকে বেরোবার আগেই লাঠি সরিয়ে ফেলে। খুব ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলাম। শার্লি নিজে কেন এমন করছে? পরদিন তোমাদের কথা শুনে মনে হলো শার্লি আসলে চাইছে তোমার বাড়িতে গিয়ে থাকতে। আগে রাজি হয়নি সেই লজ্জায় মুখ ফুটে আর বলতে পারছে না। তাই এটা যদি একটা ভূতুড়ে বাড়ি প্রমাণ করা যায় তুমি জোর করে ওকে নিয়ে যাবে।

ফাদারের ব্যাপারটা কী?

জন একটা সৎ কাজে বাড়িটা কিনতে চেয়েছে। এ কাজে ফাদারেরও সমর্থন আছে। এটা জানতে পেরে আমি ঠিক করলাম শার্লির তৈরি করা ফাঁদেই ওকে ফেলবো, যাতে ও নিজে থেকেই তোমার সঙ্গে থাকতে রাজি হয়।

আর ওঝা?

কিসের ওঝা? তিনিই তো জন হলওয়েল। জানো না বুঝি এক সময় নাটক করা খুব পছন্দ করতেন? ফাদারকে বলেছি শার্লি যাতে বাড়িটা এ কাজে দান করে তার ব্যবস্থা আমরা করে দেবো, তবে তাঁকে সৎকাজের জন্য দুটো মিছে কথা বলতে হবে।

আলফ্রেড কিছুক্ষণ চুপ থেকে কী যেন ভাবলো। তারপর বললো, এসব কিছু তুমি করেছো আমার আর শার্লির জন্য।

আমি সায় জানিয়ে বললাম, তোমরা ভাইবোন একে অপরকে ভালোবাসো অথচ তুচ্ছ অভিমানের কারণে একসঙ্গে থাকতে পারছে না। ভালো করিনি আলফ্রেড?

আমি তোমাকে নিয়ে কী ভেবেছি জানো?

কী ভেবেছো?

কথাটা তোমাকে আগেই বলবো ভেবেছিলাম। আমি ঠিক করেছি আমার পেনার্থে এর বাড়িটা তোমার নামে উইল করে যাবো। যতদিন আমরা বেচেঁ আছি থাকবো। তুমি তোমার বন্ধুদের নিয়ে যখন খুশি নিজের বাড়িতে বেড়াতে আসবে। এক সময় তোমার নিজের আলাদা জগৎ হবে। যখন আমরা থাকবো না তখন তুমি এসে থাকবে তোমার বউ ছেলেমেয়েদের নিয়ে। আমার বউ-ছেলে-মেয়ের কথা শুনে ওরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। লজ্জায় আমি কী বলবো কিছু ভেবে পেলাম না। বুড়ো হলে কি মানুষের মুখে কোনো লাগাম থাকে না।